বাংলাদেশের রাজনীতি

(১৯৮২-৯০)

এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ

১৯৯৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382788

Dhaka University Library
382788

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমদ
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

গবেষক
নাছিমা খাতুন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

M.Phil.

382788

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

382788

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। কোন গবেষণা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন না হলে তা মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় না। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সঠিকভাবে গবেষণা সম্পন্নের জন্য প্রয়োজন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা। উপস্থাপিত গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে আমি অনেক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অকৃপন সাহায্য ও সহযোগীতা পেয়েছি।

এই গবেষণা পত্রটি প্রণয়নে যার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন আমার গবেষণা পত্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা, সযত্ন, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শতে আমি আমার এই গবেষণা কর্মটি যথা সময়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

একই সাথে স্মরণ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং সকল শিক্ষক মন্ডলীকে যাদের সাহায্যে বিগত বছরগুলোতে আমার পক্ষে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছে। গবেষণা কর্মটি চলাকালীন সময়ে তাদের প্রত্যেকের মূল্যবান উপদেশ এবং গবেষণা সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশ আমার গবেষণা কর্মটিকে সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাদের সকলের প্রতি আমি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং আমার অন্যান্য শুভাকাংখী ও সতীর্থদের যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতা বিভিন্নভাবে আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে।

জীবনের দুর্গম পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ উত্তরনে যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন তাদের সকলেই ভাস্বর হয়ে থাকবে আমার স্মৃতি পটে।

তারিখ ঃ ০৫/০৭/১৯৯৫ইং

নাছিমা খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়/

ভূমিকা ১-৮

দ্বিতীয় অধ্যায়/

বাংলাদেশ ঃ সামরিকশাসন (১৯৮২-৯০) ৯-২৬

তৃতীয় অধ্যায়/

বাংলাদেশে (১৯৮২-৯০) সময়ে সমাজের বিভিন্ন সেকটরের দৃশ্য পট। ২৭-৬২

চতুর্থ অধ্যায়/

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কল্পে সামরিক ও স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে (১৯৮২-৯০) ভূমিকা। ৬৩-৬৯

পঞ্চম অধ্যায়/

গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান '৯০ এবং সামরিক ও স্বৈরশাসকের পতন। ৭০-৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়/

উপসংহার

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী। ৮৫-৯০

382788

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

রক্তপাতহীন যুদ্ধের নাম রাজনীতি। রক্তাক্ত রাজনীতির নাম যুদ্ধ।[১] বিশ্বের সকল সমাজ-সংঘাত এ যাবত মানুষের ইতিহাসে যা ঘটেছে কখন ও তা রাজনৈতিক যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধময় রাজনীতির পরিনতি। কখনও জাতি স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে আগ্রাসনের জন্যে, কখনও আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে আবার কখনও অধিকার আদায় অথবা নিপীড়ন, আধিপত্য, বঞ্চনার প্রতিবাদে ছিল এই সব যুদ্ধ। হাজার বছরের বাঙ্গালি জাতি বিকাশের ইতিহাসে ব'ীপের এই ভূখন্ডে ও শ্রেণী সংঘাত, স্বাধীকার আদায়ের উত্থান, মুক্তি সংগ্রাম রাজনীতির ইতিহাসে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। রাজনৈতিক লড়াই এর ইতিহাসে নানা ঐতিহ্য রক্ত আর অশ্রুতে লেখা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস অসম্ভব আত্মত্যাগময় সংগ্রামের ইতিহাস। দুর্ভাগ্যই বলতে হয় উপনিবেশ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি দু'দশকেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মঙ্গল বয়ে আনেনি। নগর বিকাশের যুগে রাজনীতি রূপ নিয়েছে শ্রেণীভূক্ত মানুষের সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে। ব্যাপকভাবে বঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কথা শত সহস্র মুখে বলা হলে ও নগর কেন্দ্রিক রাজনীতি কখনও তাদের ভাগ্য ফেরায়নি। এই ভাগ্য বিড়ম্বিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের নামে তাই অবিরাম বহমান রয়েছে এদেশের রাজনীতি আর বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন সংগ্রাম। বাংলাদেশের রাজনীতি দু'দশক অতিক্রম করেছে। এই দু'দশকের রাজনৈতিক কার্যক্রম আমাদের জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সত্তা, স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় ও। এই সময়ের ভিতরে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পেয়েছি। ৭১ থেকে ৭৫ একটি অধ্যায়, ৭৫ থেকে ৮২ দ্বিতীয় অধ্যায় এবং ৮২ থেকে ৯০ ছিল তৃতীয় অধ্যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রতিটি অধ্যায়ই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

382788

একাত্তরের রক্তঝরা দিন গুলো অতিক্রম করে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এক রক্তের নদী সাঁতরে তুলে আনেন স্বাধীনতার লাল গোলাপ। জাতিকে উপহার দেন এক দুর্জয় চেতনা, স্বাধীনতার গৌরববোধ, আত্মসম্মানের দুর্লভ দ্যুতি। স্বাধীন বাংলাদেশ রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে সংসদীয় ব্যবস্থা নিয়ে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহন করেন। নতুন রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নেই জনগণ লাভ করে গণতান্ত্রিক সংবিধান। ৭২- এর সাময়িক সংবিধান আদেশে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। শেখ মুজিব তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামীজীবনের স্বপ্ন সাধ পূরনের পর আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে গিয়ে চরম সংকটে নিপতিত হন। তিনি আপ্রান চেষ্টা চালান বিধ্বস্ত অর্থনীতির পূর্ণ গঠনের জন্য। কিন্তু একদল সুযোগ সন্ধানী সারাদেশে দূর্নীতি, স্বজন প্রীতি এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত শেখ মুজিব ব্যর্থ হন।[২] ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৪) আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা হয়। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৭৫) জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাকশাল গঠিত

১) আশরাফ কায়সার, বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১।

২) মাহমুদ শফিক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, কবীরানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৪।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

হয়। অন্যান্য দলের অবসান ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের জন্যে যে সব সহযোগী প্রতিষ্ঠান তাদের ও স্বাভাবিক গতি হয় রুদ্ধ। এমনি পরিস্থিতিতে ১৫ই আগষ্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী একটি অংশের অভ্যুত্থানে আত্মীয়-স্বজন সহ এ জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হন।[৩] এই ভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

বাহাত্তরে রাজনৈতিক অগ্রগতির যে উর্বর ধারার শুভ সূচনা হয়, পঁচাত্তরের মাঝামাঝি মিশে যায় উষর মরুভূমিতে। অভ্যুত্থান প্রতি অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে ওঠে সন্ত্রাস কবলিত। ডান, বাম কেন্দ্রের টানাপোড়নে জাতীয় ঐক্য পর্যন্ত ব্যাহত হয়। স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষের বির্তকে সমাজ-জীবনের এমনি ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭৫- এর ৭ই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলেন। ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতি যেমন গর্বিত পদভরে চলতে শুরু করেছিল, পঁচাত্তরের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশের রাজনীতি সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাত্রা শুরু করে ভীরু, কম্পিত পদে। ১৯৭৬ সালের ১লা মে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে ভাষনের মধ্যদিয়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করেন এবং ৭৮ সালের দিকে নিজের দল বি এন পি গঠন করেন। জিয়ার বি এন পি সরকারকে তীব্র রাজনৈতিক বিরোধীতার মোকাবেলা করতে হয়নি। তবে জিয়াকে প্রায় ১৭/১৮টি সামরিক অভ্যুত্থান মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু এ অবস্থা ও বেশীদিন টেকেনি। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রাণ হারালেন চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে। এরপর উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রথমে দায়িত্ব ভার গ্রহন এবং পরে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র ক'মাস পরে জেনারেল এরশাদ ঘটালেন রক্তপাতহীন আর এক সামরিক অভ্যুত্থান। এরশাদ জোর করে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের কাছ থেকে পদ ত্যাগ পত্র সংগ্রহ করেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। নতুন করে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের দুঃখ জনক কবলে পড়ে।

প্রায় ৯ বছর ক্ষমতায় থেকে এরশাদ নিঃশেষ করেছেন রাজনীতির সুচিতা। ধ্বংস করেছেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ। এই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বটে কিন্তু ঐসব নির্বাচনের ছিল না কোন গ্রহনযোগ্যতা। নিজেই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু ভোটার বিহীন নির্বাচনে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু গণপ্রতিনিধিদের এড়িয়ে। এইভাবে রইলেন প্রায় ৯ বছর। গেলেন গণ-অভ্যুত্থানের ফলে। দীর্ঘ ৯ বছরে তার কুশাসন, নীতিহীনতা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সঞ্চিত হয় জনগনের ক্ষোভ। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বাধ্য হন পদত্যাগ করতে। ক্ষমতা তুলে দেন তিন দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের হাতে। একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে যা বুঝায় বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের মাত্র তিন মাসের শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে থাকে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় অবাধ, সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ নিনের সামরিক ও স্বৈরশাসনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করে সাধারনের শ্রদ্ধা লাভ করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলের নেত্রী হিসেবে সংসদে তাঁর যোগ্য ভূমিকা পালন করে গণতান্ত্রিক সরকারের পূর্ণাঙ্গতা দিতে সার্থ হন। ৬ আগষ্ট সরকার ও বিরোধী দল সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আবার সংসদীয় পদ্ধতি ফিরিয়ে আনে।[৪]

---

৩) অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৫-১৬।

৪) মেজর রফিকুল ইসলাম, বাধীনতার ২২ বছর, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষা যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধানই এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। প্রত্যেকটি গবেষনার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। কোন কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য তা অত্যাবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের রাজনীতির (৮২-৯০) সময়ের এক সার্বিক রূপ চিত্রায়নের প্রয়াস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য গুলি- বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, বেসামরিক সরকার উৎখাত, সামরিক শাসন জারির কারন এবং জেঃ এরশাদের ক্ষমতা দখল পর্বের চালচিত্র সামগ্রিক ক্যানভাসে জনসম্মুখে তুলে ধরা। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এই সময়কাল হচ্ছে এক কালো অধ্যায়। জনগনের নূন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদ দলিত করে এক ব্যক্তির শাসনকে দীর্ঘায়িত করার এক ইতিহাস। এই ইতিহাস ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যেন বাংলাদেশে আর কখনো কোন স্বৈরশাসকের আবির্ভাব না ঘটে। যদি কোন নির্বাচিত সরকার ব্যর্থতার কারনে জন প্রিয়তা হারায়, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগন সরকার পরিবর্তন করবে। নির্বাচিত সরকারকে জোরে ক্ষমতাচ্যুত করে অবৈধ পন্থায় কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান নবজাত স্বাধীন দেশকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন মাত্র চার বছর। প্রবল ব্যক্তিত্বশালী এবং জন প্রিয় নেতা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় পাঁচ বছরের বেশী থাকতে পারেনি। তুলনায় অনেক নগণ্য হলেও এরশাদ সুকৌশলে সামরিক বাহিনীর সমর্থনে একটানা ৯ বছর রাজত্ব করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষের মাঝে এরশাদের মতো এক রাজনৈতিক পরগাছার পক্ষে একটানা ৯ বছর শাসন করা কম কথা নয়। কি ছিল তার শাসন কৌশল ? তা খুঁজে বের করা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সময়ে স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্র পুণঃউদ্ধার ও পুণঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজনৈতিক দল ও জোট, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি তথা সর্বস্তরের জনগন পুরো সময়ব্যাপী ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা। অতীতের অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা অলিখিত থাকায় সে গুলোতে যারা আত্মত্যাগ করেছিলেন জাতি তাদের অবলীলায় ভুলে গেছে।

৯০ এর ১৯শে নভেম্বর তিনজোটের জন প্রত্যাশা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষনা যা বাংলাদেশের জনগনের ম্যাগনাকার্টা রূপে পরিচিত আন্দোলনের গুনগত উত্তরনে কি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, গণ অভ্যুত্থানের সাফল্যের পথ নির্মানে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল তা বিশ্লেষন করা ।

দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিভাবে অভ্যুত্থানমূখী হয়ে ওঠে এবং এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এই ঘটনাবলী আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে আন্দোলনের সূচনা হয় ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তা শেষাবধি গণঅভ্যুত্থান ৯০ এ রূপান্তরিত হয় সেই ইতিহাসের কতিপয় দিক তুলে ধরা।

Dhaka University Institutional Repository

একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে ৮০-র দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির এই চাল চিত্রের বাস্তবদৃশ্য জনসম্মুখে তুলে ধরাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। তা দরকার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রয়োজনেই। যাতে আগামী প্রজন্ম শিক্ষা নিতে পারে। ৮০-র দশকের এ সব ঘটনা আজ ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত। যদিও আমাদের জীবনেরই ঘটে যাওয়া এই সব ঘটনা। (৮২-৯০) বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চের পট পরিবর্তন নতুন প্রজন্মকে জানানো দরকার। জানানো দরকার ইতিহাসের এই অধ্যায়টা।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে (৮২-৯০) এই সময় কালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যতিক্রমধর্মী ও ঘটনা বহুল এক অধ্যায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা বাধা বিপত্তির পর সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ ও পরিবর্তনের যখন একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রথার বিকাশ হচ্ছিল। একটি চরম অনিশ্চিত অবস্থা থেকে দেশকে একটি সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর অধ্যায়ে উপনীত ঠিক সেই সময়ে (১৯৮২) সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দৃশ্যত রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করে উচ্চাভিলাষী এক জেঃ বাংলাদেশের শাসন কাঠামোর প্রধান কর্নধারে পরিনত হয়ে বাংলাদেশে যত ধরণের বেসামরিক ইনস্টিটিউশন ছিল তা হিসেব করে ধ্বংস করে শুরু করেন গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রক্রিয়া। এই সামরিক সরকার একটির পর একটি স্বৈরাচারী কূট কৌশল প্রয়োগ করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেকে আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষাবধি তা রূপান্তরিত হয় গণ অভ্যুত্থান ৯০-এ। যাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজয় বলে অভিহিত করা যায়। এর ফলে পতন ঘটে স্বৈরাচারী সরকারের। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি সব অনিশ্চিয়তা কাটিয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে রচিত হয় ধারাবাহিকতার এক স্বর্ণ সূত্র। প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নির্মল এক প্রবাহ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই অধ্যায়ের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলোঃ অধ্যায়ের শুরুতে (১৯৮২) সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করে অবৈধ পন্থায় এক সামরিক শাসকের আগমনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে শেষ সীমায় পৌছে ছিল। আবার ঠিক এই অধ্যায়ের ভেতরেই (১৯৯০) একটি সফল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুণঃ উদ্ধার ও পুণঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গৌরবজ্জ্বোল অধ্যায়ের সূচনা করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই প্রথম বারের মত সরকার পরিবর্তনের একটি ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে গোপন হত্যা বা সামরিক অভ্যুত্থানের কোন সম্পর্ক ছিল না। পরিবর্তন ঘটল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই প্রথম সরকার পরিবর্তন হয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অতীতে যার কোন নজির নেই। এই প্রথম রাজনীতির বিজয় হয়েছে। আন্দোলন শেষে রাজনৈতিক জোট গুলো হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে দলীয় পর্যায়ে এক ধরণের ঐক্যমতের সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে এর ও কোন নজীর নেই। শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে, যার রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ এর সংসদ নির্বাচনের পরে এই প্রথম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। যে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সমস্ত গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতির এই অধ্যায়টি (৮২-৯০) গবেষণা ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দাবী রাখে বলে আমি মনে করি। সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়কে আমি আমার এম. ফিল গবেষণার বিবেচনায় এনেছি। তাই আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ের উপর গবেষণা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে মনে করি। সেই যৌক্তিকতার দাবীতেই এই অধ্যায়ের উপর এম, ফিল গবেষণাপত্র তৈরী করার পরিকল্পনা করেছি এবং বাংলাদেশের রাজনীতি (৮২-৯০), এই সময়ের উপর একটি পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এই গবেষণায় নিয়েছি।

বাংলাদেশের রাজনীতির (৮২-৯০) সময়ের উপর আলোকপাত করে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গবেষণা জার্নালে এ বিষয়ের আলোচনা এবং এতে নানা অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রনয়ন করেছেন তথ্যপূর্ণ পুস্তক। সৈয়দ আবুল মকসুদ এর 'গণ আন্দোলন (৮২-৯০) '(১৯৯১) গ্রন্থটিতে ৮০-র দশকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে. এদেশের সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও জোট, ছাত্র সমাজ, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি গণআন্দোলনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরেছেন। মূলত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং ব্যক্তি ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ৯টি বছর দেশে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের ভূমিকা ও বক্তব্যই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত এর 'নব্বই-এর অভ্যুত্থান' গ্রন্থটি এই সময়ের উপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নব্বই-এর অভ্যুত্থান এর নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। মূল বিষয়টি হচ্ছে আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকা, সেই ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্য ভাবেই এসে গেছে আন্দোলনের প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যতের আকাংখার কথা। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, পি এস সি এর "স্বৈরশাসনের নয় বছর (১৯৮২-৯০)" এই গ্রন্থটি এ সময়ের উপর একটি তথ্যবহুল একই সংগে বর্ণনা মূলক ও বিশ্লেষনধর্মী একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, কিভাবে এরশাদ ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রের নিপুন জাল পাতেন, ক্ষমতা দখলের পরে কিভাবে ক্ষমতার ভিতকে শক্তিশালী করেন, কিভাবে উন্নয়নের নামে অনুন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমান ব্যয়, বিদেশে অর্থ পাচার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুন্ঠন ইত্যাদি অবাধে শুধু চলতেই দেননি নিজে ও স্বপরিবারে এতে সিংহভাগ বসিয়েছেন সে সব কাহিনী এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ এর 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট' গ্রন্থটি গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ৭টি লেখার সমন্বয়ে উপস্থাপিত। এর মধ্যে "বাংলাদেশ রাজনীতিঃ জেনারেল এরশাদের উত্থান ও পতন" প্রবন্ধটি এই সময়ের উপর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জেঃ এরশাদ কিভাবে নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে, গণ আন্দোলনের প্রকৃতি কেমন ছিল, কিভাবে তার পতন ঘটে এই সময়ে (১৯৮২-৯০) সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে কি অবস্থা বিরাজমান ছিল, গণ অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির (১৯৮২-৯০) সময়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

৯০ এর গণ অভ্যুত্থান বা এই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ক্রমের উপর আলোক সম্পাত করে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ/পুস্তক রচিত হলেও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০) সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক আলোচনা অদ্যাবধি হয়নি। এখনও পর্যন্ত এই সময়ের পশ্চাৎপদ বিশ্লেষণ করে ৮২ সাল থেকে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হয়নি। এ বিষয়ের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে গুলো কোন মৌলিক বা গবেষণা গ্রন্থ নয়। এ গুলোকে প্রমাণ্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসেবে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পে সেই অভাব পূরনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্ত বই, প্রবন্ধ, জার্নাল এই সময়কালের উপর যদিও উল্লেখযোগ্য অবদান কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। মোটি কথা এই অধ্যায়ের উপর কোন পদ্ধতিতাত্ত্বিক গবেষণা এ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সময়কালটি (১৯৯৮২-৯০) একটি বিতর্কিত যুগ হিসেবে চিহ্নিত। সেই জন্য আমি এই অধ্যায়ের উপর পদ্ধতিতাত্ত্বিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে সঠিক মূল্যায়ন করে যে অপূর্ণতা রয়েছে তা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছি।

বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ পরীক্ষণযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটনার অনুসন্ধান বা ঘটনাগুলোর সম্পর্ক আবিস্কার করে সূত্রের আকারে প্রকাশ করে কোন বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করার সুশৃংখল পদ্ধতিকে গবেষণা বলে। কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কতকগুলো পন্থা অবলম্বন করতে হয়। বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০) এই অধ্যায়টি একটি ধারাবাহিকতার ফসল তাই ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষনের খাতিরে এবং সংগৃহীত উপাত্ত সমূহ বিন্যস্ত করতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরী করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিকট থেকে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। অন্য দিকে বইপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িকী, জার্নাল ইত্যাদি মাধ্যম থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি ৬টি সুপরিকল্পিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বাংলাদেশের (১৯৮২-৯০) সময়ের রাজনীতির চালচিত্র প্রসংগে বিচার বিশ্লেষন করা হয়েছে। ছয় অধ্যায়ের এই গবেষণা প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয়েছে যেন (৮২ থেকে ৯০) এই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি অধ্যায়ই তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্লেষনধর্মী এবং বস্তুনিষ্ঠ।

প্রথম অধ্যায়টি প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মান করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর অবস্থান, ভূমিকা ও স্বরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপ্রিয় হলেও সত্য যে বার বার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ঘটেছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের প্রপঞ্চটি বার বার ফিরে আসছে এবং দীর্ঘ এক স্থায়ী সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সম্প্রতি অতিক্রম করেছি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমনের প্রেক্ষাপট, এর কারন ও ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, এবং কিভাবে এরশাদ ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রের নিপুন জাল পাতেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে কিভাবে সামরিক শাসক কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করেন সে সব কাহিনী প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ক্ষমতা দখলের পর সামরিক সরকার সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের জন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলো ধ্বংস করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছে তা তথ্য, নথিপত্র ও দলিলাদির এক ভান্ডার গড়ে তুলে সে গুলো যথাযথ উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে।

এই সময়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজসহ সার্বিক ভাবে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল জটিল। পুরো সময়টাই রাজনৈতিক ভাবে হয়ে উঠেছিল নিষ্ফলা এবং অপচয়ের। গণতন্ত্র এখানে বন্দী থাকে ইতিপূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এই সময়ের বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল গণতন্ত্র বিহীন এক অন্ধকার যুগে। যে গণতন্ত্রহীনতার মাত্রিকতার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না বরং তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল সামাজিক বলয়ের প্রতিটি অঙ্গনে। রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ থাকলে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে নিয়ন্ত্রনহীন ও জবাব দিহি বিহীন সমাজে তখন নানা দুর্ভোগ ও দুর্লক্ষন দেখা দেয়। আমাদের সমাজেও তেমনটি ঘটেছে। এই বিষয়টি এই অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই সময়ে সামরিক নিয়ন্ত্রনাধীন স্বৈরশাসনামলে বিশেষতঃ এরশাদীয় কর্তৃত্বে কিভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের এবং প্রশাসনের সামরিকীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে তা তথ্য দলিলাদির সাহায্যে যথাযথভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এক জেঃ কর্তৃক সংবিধান ও সেনা আইন লঙ্ঘন করে প্রধান নির্বাহী পদের সামরিকীকরণের গভীর তাৎপর্যবাহী ব্যাখ্যা ও সুসংহতভাবে এসেছে।

আমলা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু (১৯৮২-৯০) এই সময়ে রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকার ফলে নিয়ন্ত্রন হীন ও জবাবদিহি বিহীন এই আমলাতন্ত্র কিভাবে স্বৈরাচারের সহযোগী হয়ে উঠেছে কিংবা নিজেই স্বৈরাচারের রূপ নিয়েছে যার ফলে সমাজে নানা দুর্ভোগ ও দূর্লক্ষন দেখা দেয় তার তাৎপর্যবাহী ব্যখ্যা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে স্বৈরশাসনের ফলে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির একটি বস্তনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেশের সমগ্র অর্থনীতি (১৯৮২-৯০) সময়ে যে অবস্থায় পৌছেছিল তার নিজস্ব দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র অর্থনীতি কিরূপ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হবে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূণ উপাদান। বলা যেতে পারে সিভিল সমাজের ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যম নির্বাচন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সময়ে নির্বাচন প্রথাকে এমনভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল যে, সিভিল সমাজের সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে। এই সময়ের ভেতর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সবগুলোই ছিল প্রহসনের এবং লোক দেখানো নির্বাচন এবং প্রত্যেকটির চেহারা একই। ফলে এই সময়ে নির্বাচন নামক একটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় এবং নির্বাচন কমিশন নামক একটি জননন্দিত প্রতিষ্ঠানকে হাস্যপদ করে তোলা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতীয় অগ্রগতির সূচক। অথচ এই সময়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয় দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো। (১৯৮২-৯০) সময়ে শিক্ষাঙ্গনগুলোর দিকে তাকালে নিজেদের অপরাধী মনে হয়। অপরাধী মনে হয় এই কারনে যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের যে সুমহান ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করেছি। নিছক রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য সেই ছাত্র সমাজকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বৈরাচারী সরকার কিভাবে ব্যবহার করে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার নির্মম প্রহসন চালিয়ে ছিলেন তার সুস্পষ্ট ধরন দেখে।

সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সহিত জড়িত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে (১৯৮২-৯০) সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ফেলে দেয়। এ ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে গত এক দশকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ দেশের গণতন্ত্র প্রিয় জনগণ রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহ, ছাত্র সমাজ, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতি কর্মীরা, বিচার পতিরা তথা সর্বস্তরের জনগণ প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তার ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে একটি গণমুখী কাঠামো নির্মাণে তাদের ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলতঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং ব্যক্তি ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ৯টি বছর দেশে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহনকারীদের ভূমিকা ও বক্তব্যই এ অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়।

৯০ এর গণ অভ্যুত্থান এ দেশের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারকে হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ এর ২৭ নভেম্বর এসে অভ্যুত্থান মূখী হয় ওঠে তা শেষাবধি গণঅভ্যুত্থান ৯০-এ রূপান্তরিত হয় পঞ্চম অধ্যায়ে সেই দিন গুলোর ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি দিনের ঘটনাই এগিয়ে নিয়ে গেছে জনতার আন্দোলনকে। এই সময়ের ঘটনা পরম্পরা শুধু খবরের কাগজসুলভ বিবরণ মাত্র নয়। প্রতিদিনের প্রতি মূহুর্তের এই ইতিহাস একটি অকল্পনীয় অথচ বহু আকাংখিত স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে তিলোত্তমা প্রতিমার মতো। এই উত্তাল দিনের ধারা ক্রমিক বর্ণনা আগামী দিনের ইতিহাস রচনাকেই কেবল সাহায্য করবে তা নয়। উপরন্ত জনতার অপরিমেয় শক্তি উপলব্ধি করতে ও সাহায্য করবে।

শেষ অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে উপসংহার এবং তথ্যসূত্র নির্দেশ যা আলোচনা ও বিশ্লেষনকে প্রমান্য করবে ও গভীরতা দিবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির (১৯৮২-৯০) সময়ের বিভিন্ন প্রপঞ্চের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান দুঃসাহসী গবেষণা প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্যানভাস। প্রচলিত ও গতানুগতিক বিভিন্ন ব্যাখ্যার অন্তসারশূন্যতা স্পষ্ট করে অত্যন্ত বিপদজনক সত্যগুলোকে এবং অপ্রিয় অথচ বস্তুনিষ্ট ইতিহাসকে বিবেকী দায় ও সামাজিক অঙ্গীকারের তাগিদে গভীর অনুসন্দিৎসায় ও কঠোর শ্রমে সর্বাধুনিক তত্ত্বে এ যাবৎ অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ করে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা ও নির্মোহ দৃষ্টি থেকে অংশ সমূহের দ্বিমুখী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহযোগে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি নিবদ্ধ করা হয়েছে পদ্ধতিতাত্ত্বিক, বিশ্লেষনধর্মী এবং একটি তথ্যবহুল একই সঙ্গে বর্ণনা মূলক প্রকল্প হিসেবে। বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বিশেষ সময়ের সামাজিক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দলিলসম হিসেবে।

এই ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমেই সম্ভবতঃ পাঠক সমাজ প্রথম বারের মত প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান পাবেন। পরিবেশ পরিস্থিতি সংঘটিত ঘটনাবলী ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার অর্থ ও তাৎপর্য নতুনভাবে অনুভব করবেন এবং আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটি একজন দেশ প্রেমিক প্রগতিশীল চেতনা সম্পন্ন সমকালীন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে অবস্থান দৃঢ়তর করবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ ঃ সামরিক শাসন
(১৯৮২-৯০)

সামরিক শাসন রাষ্ট্র শাসন বিদ্যায় নবতর অধ্যায় হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সদ্য-সামরিক রাজনীতির ইতিহাসে একটা দুঃসময়ের জন্ম দিলে ও আজ আমাদের সামনে প্রায় বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে এশিয়া,আফ্রিকাও ল্যাটিন আমেরিকার দুই - তৃতীয়াংশের ও বেশী দেশে কমবেশী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে শুরু করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিনত হয়েছে। সঙ্গত কারনেই এ বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে। একটি দেশের ভাগ্যন্নোয়নে তার ভবিষ্যত পথরেখা বিনির্মানে এবং সর্বোপরি যে সকল অনুমিত কারনে সামরিক শাসনের আবির্ভাব ঘটে তার অপসারনে সামরিক শাসন কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখার তাগিদ থেকে সামরিক শাসনের ফলাফল নিয়ে গবেষণার সূচনা হয়। বিগত কয়েক দশক যাবৎ রাষ্ট্র ক্ষমতায় সেনা নায়কদের উপর্যুপুরি আগমন প্রস্থান আর পুনরাগমনের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সামরিক কর্তৃপক্ষের শাসন সংক্রান্ত বিষয়টি রাজনীতি বিশ্লেষনে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে। এ কারনেই প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক মরিস জানোইচ (Morris Janowitz) প্রায় পঁচিশ বছর আগে যথার্থই বলেছেন যে, যে সব সাংগঠনিক ও পেশাগত গুণাবলী একটা নতুন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কিংবা কুক্ষিগত করতে সাহায্য করে, সুচারু রূপে দেশ পরিচালনায় এ সবই সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়।[১] নতুন রাষ্ট্র সমূহ নিজেদেরকে আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে যে সব বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে উক্ত দেশ সমূহের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে সামরিক বাহিনী কর্তৃত্বে আরোহন করেছে। এসব রাষ্ট্রে এ বিষয়টি সত্য বলে লক্ষ্য করা গেছে যে, এসব দেশের জনগণ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো তখন সাধারন মানুষের আশা আকাংখা গগনচুম্বী হয়ে পড়ে এবং তারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে যে, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেই রাতারাতি দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে এবং জনগনের জীবনে মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে আর্থনীতিক অব্যবস্থা, দরিদ্রতা এবং দূর্বল প্রশাসনের কারনে উন্নয়নের পরিবর্তে এই দেশগুলো আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং জনগন হয় হতাশ। রাজনৈতিক, সংসদীয় ও গনতান্ত্রিক সংগঠনগুলো বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে না। পর্বতসমান সমস্যার সমাধানে রাজনীতিক ব্যর্থতার সুযোগে রাতের অন্ধকারে উচ্চাভিলাষী সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তখন সামরিক শাসকরাই হয়ে দাঁড়ায় অনেক গুলো বাস্তবপোযোগী ও আপাত দৃষ্টিতে স্থায়ী বিকল্প সমূহের মধ্যে একটি।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছর পর বাংলাদেশ পুনরায় সামরিক শাসনের নিগড়ে পতিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর

---

১) Morris Janowitz. The Military in the political Development of new nations. Chicago University of Chicago press. 1964. P. 1.

Dhaka University Institutional Repository

রহমানকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা হয়। এর পর চলতে থাকে একের পর এক অভ্যুত্থান, ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। অতঃপর ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের কাল শুরু হয় এবং ১৯৯০ এর গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সে শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপ্রিয় হলে ও সত্য যে, বার বার সেনা বাহিনীর উপস্থিতি ঘটেছে, গণতন্ত্র মার খেয়েছে, পদদলিত হয়েছে। সেনা বাহিনীর এই ধরনের উপস্থিতি কোন সুস্থ মানুষের কাছেই সমর্থন যোগ্য নয়। এটা সম্পূর্ন বেআইনী ও অবৈধ এবং নিয়ম শৃংখলা ভংগেরই একটা প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামরিক শাসন সংক্রান্ত গবেষণার মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে এ দৃষ্টিভংগী থেকে সামরিক শাসনের ব্যাখ্যা দাঁড় করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরো বেশী করে, কেননা বাংলাদেশে সামরিক শাসনের প্রপঞ্চটি বার বার ফিরে আসছে এবং এক দীর্ঘ স্থায়ী সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সম্প্রতি অতিক্রম করেছি। এবার আসা যাক বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমনের প্রেক্ষাপটে।

ঐতিহাসিক কারনেই বাংলাদেশের সামরিক শাসনের পর্যালোচনা করতে হলে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থাকে স্মরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী কেন দেশ শাসন ও পরিচালনার ভার নিলো ? কোন পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে অংশগ্রহন করলো তা বুঝতে হলে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবহুল ইতিহাসকে বিশেষভাবে বিশ্লেষন করে দেখতে হবে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ।[২] এই রাজনৈতিক যুদ্ধে যে সব সৈনিকেরা অংশ গ্রহন করেছিলো তাদের কোন ক্রমেই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও জনতার রাজনৈতিক চেতনা এবং আশা-আকাংখার সঙ্গে এইসব সৈনিকদের চেতনার সাদৃশ্য ছিলো। দেশ মুক্ত হওয়ার পরে এই সব রাজনীতি সচেতন সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে যেসব অফিসার সৈনিকেরা অবস্থান করছিলেন তাঁরাকোন মতেই অরাজনৈতিক ছিলেন না।[৩]

৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয়। বিজয়ের আনন্দে সমগ্র জাতি যখন আত্মহারা তখন অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীন। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন এবং ১০ই জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন।[৪] তারপর শুরু হয় নতুন পদযাত্রা। দেশ তখন যুদ্ধ বিধ্বস্তস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য, প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। হাজার হাজার নিরন্ন শরনার্থীদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে স্বদেশের মাটিতে। প্রায় সবার হাতেই অস্ত্র, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অনিশ্চিত। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দারিদ্র কবলিত বাংলাদেশের দায়িত্ব শেখ মুজিবের স্কন্ধে অর্পিত হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্বাধীনতার সনদই ছিল সকল

---

২) মেজর রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩।

৩) কাজী নূর-উজ্জামান, লেঃ কর্নেল (অবঃ) "মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি" (গণকণ্ঠ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮১) : জানা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃঃ ১৪

৪) মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের উৎস। বস্তুত স্বাধীনতার সনদ দিয়েই প্রবাসী সরকারের আমলে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান চালু হওয়া পর্যন্ত এটি ছিল রাষ্ট্রের সংবিধান। এই সনদের ফলে তৎকালীন সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। জনগনের অবিতর্কিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী বাংলাদেশে সাময়িক সংবিধান আদেশ জারী করা হয়। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের ফলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং শেখ মুজিব প্রধান মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার শূন্য হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ শুরু করে। সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের মাটিতে ভারত প্রত্যাগত প্রায় এক কোটি শরনার্থীর পূর্নবাসন ব্যবস্থা; তৃতীয়তঃ মুক্তিযুদ্ধের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত সড়ক, সেতু ও রেল যোগাযোগ মেরামত ও সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা; চতুর্থতঃ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি এবং পঞ্চমতঃ বিধ্বস্ত শিল্প কারখানাগুলোকে পূনরায় উৎপাদন মুখী করে তোলো।[৫] এছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের মতই বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাংখা ছিল গগনচুম্বী। একমাত্র আলাভিদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ ছাড়া স্বল্প সময়ে এই গগনচুম্বী আশা আকাংখা বাস্তবায়ন সম্ভবপর ছিল না। ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দিলো কালো মেঘের ঘনঘটা, জনগনের অসন্তুষ্টি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও রাজনৈতিক টাউটদের লোভ লালসা সদ্য স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দকে গ্রাস করে ফেললো।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতি দেশব্যাপি দুর্ভিক্ষ, রক্ষী বাহিনীর নির্যাতন ও এক শ্রেণীর রাজনৈতিক টাউটদের অবৈধ কর্মকান্ডের ফলে আওয়ামী লীগ সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশ বলে সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারী করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষনার মাত্র ২৭ দিন পরে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে যে আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় সামরিক শাসনের সূচনা হয়েছে নব্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট, নেতৃত্বের কোন্দল, আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র, আর্থনীতিক অব্যবস্থা ও খাদ্যাভাবজনিত কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সুযোগে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। ফলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে দারিদপীড়িত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার চক্রান্ত শুরু হয়। ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী অকস্মাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট একদল বিদ্রোহী সৈনিকের (মেজর) ঝাঁক ঝাঁক গুলিবর্ষনে বিদীর্ন হলো নিস্তব্ধ প্রভাত। রচিত হলো নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে নির্মম হত্যাকান্ডের এক কলংকিত ইতিহাস। বিশ্বাস হন্তাদের দ্বারা রচিত হলো দেশের রক্তরঞ্জিত অধ্যায়। সরকার পরিবর্তন ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সূত্রপাতের ইতিহাস। বিস্ময়কর হলে ও সত্যি যে সেনাবহিনী থেকে শৃংখলাভংগের দায়ে অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডালিমের ১৫ই আগষ্ট ভোরে বেতার ঘোষনার মাধ্যমে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়। বস্তুতঃ একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, একজন অবসর প্রাপ্ত মেজরই বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইনের ঘোষক। ইতিহাসে আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে, এই ঘোষনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারীদের প্রতিরোধ করতে কেউ এগিয়ে আসেননি।[৬]

---

৫) ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৪৭০।

৬) মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবকে হত্যার মাধ্যমে কেবিনেটের অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। এরপর ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটান। ৩রা নভেম্বর এর অভ্যুত্থানকে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপক অংশ এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এটাকে আওয়ামী লীগ তথা রুশ - ভারত পন্থীদের ক্ষমতা পুর্ণদখল প্রয়াস বলে মনে করেন। জাসদ ও সাম্যবাদী দল সে মর্মে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে প্রচার পত্র বিলি করে এবং তাদেরকে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান জানায়। ফলশ্রুতিতে ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) এক সিপাহী অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হন এবং সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন। পরবর্তীতে জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হন। জিয়ার মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী ভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন।

বিরাশির সামরিক অভ্যুত্থান ও এরশাদের ক্ষমতা দখল

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন সেনা বাহিনী প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। পদচ্যুত করেন মাত্র চার মাস আগে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে, দেশ ব্যাপি জারি করেন সামরিক আইন। মন্ত্রী পরিষদ ও সংসদকে বাতিল করেন। স্থগিত করেন সংবিধানের কার্যকারিতা। বিচারপতি আবুল ফজল আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে নিয়োগ করেন নামে মাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে। তিনি হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

২৪শে মার্চ '৮২ হঠাৎ করেই জেঃ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেননি। বা দু/এক মাস ষড়যন্ত্র করেই সামরিক শাসন জারির মত প্রেক্ষাপট তৈরী করেননি। সামরিক শাসন জারি করে দেশের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য তাঁকে দীর্ঘ সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। বলা যায় প্রায় অর্ধযুগ। প্রায় অর্ধযুগ ব্যাপী ষড়যন্ত্র করে খুব সূক্ষভাবে দাবার ঘুটি চেলে একটার পর একটা পথের কাঁটা বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়ে সুকৌশলে তাঁকে সামনের দিকে এগুতে হয়েছে। করতে হয়েছে বিভিন্ন নাটকের অবতারনা।

১৯৭৪ সালে এরশাদ লেঃ কর্নেল হিসেবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর কার্যকলাপে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর উপর খুব ক্ষিপ্ত ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদের মামা রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়ার তদবিরে আওয়ামী লীগ সরকার এরশাদকে ফুল কর্নেল হিসেবে প্রমোশন দিয়ে ভারতে প্রশিক্ষন গ্রহনের জন্য প্রেরন করেন এবং সেখানে বসেই তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন।[৭] পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন এবং পঁচাত্তরের ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পাদপ্রদীপে চলে আসেন তৎকালীন সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান। সুচতুর এরশাদ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেননি। তিনি জিয়াকে তুলিয়ে দেশে আসেন এবং সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং দাঁবার ঘুটি চেলে পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

---

৭) এলাহী নেওয়াজ খান সম্পাদনায়, এরশাদের উত্থান পতন, ওয়েসিস বুকস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে জিয়া সেনাবহিনীকে পুর্ণগঠনে বিশেষভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে নবম পদাতিক ডিভিশন থেকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন দফতরে এবং মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রামে বদলী করা হয়। মঞ্জুর ও শওকতের সম্পর্কের ও দারুন অবনতি ঘটে ঢাকাস্থ ৪৬তম পদাতিক বিগ্রেডকে সরাসরি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করাকে কেন্দ্র করে। তৎকালীন চীফ অব জেনারেল স্টাফ মঞ্জুরের এই পদক্ষেপের মধ্যে মেজর জেনারেল শওকত অবিশ্বাস ও হুমকি দেখতে পান। ধূর্ত এরশাদ মারমূখী এই দুই মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নেন। এরশাদ জিয়াকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এরা দুজনই এমবিসাস। সুতরাং দু'জনকেই ঢাকার বাইরে বদলী করা হলে ভালো হবে। জিয়া সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং এব্যাপারে জিয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাঅফিসার ও পি এস মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু এরশাদকে সমর্থন জানালে জেনারেল জিয়া উপরোক্ত পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন।[৮]

মঞ্জুর চীফঅব জেনারেলস্টাফ থাকা কালে একটি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। চট্টগ্রামে বদলী হওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মনক্ষুন্ন হন। শওকত ও মঞ্জুরের উচ্চাভিলাষের কাহিনী বর্ণনা করে জিয়ার কানভারী করে তোলার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিলেন এরশাদ। এতে মঞ্জুর ও জিয়ার মধ্যে এত দিনের আন্তরিক সম্পর্কের হঠাৎ করেই অবনতি ঘটে। এরশাদকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের পরে মঞ্জুর এতই ক্ষুব্ধ হন যে, জিয়াকে তার মনোভাব জানাতে দ্বিধা করেননি। মঞ্জুর জিয়াকে জানান যে, সেনাবাহিনী প্রধান একজন দুর্নীতিবাজ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি।[৯] পরবর্তী কালে শওকতকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ড থেকে সি.ইন, সি এর সচিবালয়ের পি এস ও হিসেবে পদস্থ করা হয়, কারন এরশাদ জিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মঞ্জুর ও শওকত দু'জনই যদি ডিভিশনের কমান্ডে থাকে তাহলে তারা অভ্যুত্থান করে ফেলতে পারেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও শওকতের বিবদমান সম্পর্ক এবং মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগত বিভাজনকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন এরশাদ। পদাধিকার বলে জিয়া এরশাদকে অমুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্টপোষকের দায়িত্ব দেন। আর এই বাহ্যিক হৃদ্যতার রূপ ধরে জিয়ার সঙ্গে এই দুই মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নেন এরশাদ।

এই সময় জিয়ার রাজনৈতিক দল বি,এন,পি তে কোন্দল দেখা দেয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জিয়া এই সংকট নিয়ন্ত্রনে আনার জন্যে চট্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য জিয়া হত্যার মাত্র চার দিন আগে ১৯৮১ সালের ২৬শে মে এক অঘোষিত সফরে চট্টগ্রাম যান। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়, এরশাদ বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী পরিদর্শনে যাচ্ছেন। কিন্তু এরশাদ চট্টগ্রামে পৌঁছেই মঞ্জুরের অফিস কক্ষে ঢোকেন এবং দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরামহীন আলাপ করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী পরিদর্শন না করে সারাদিন মঞ্জুরের সঙ্গে এত কি আলোচনা করেছিলেন তা আজও রহস্যাবৃত। বিকেল পাঁচটায় এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে পতেংগা বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। মঞ্জুর এরশাদকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে ঘৃনার চোখে দেখতেন বলে কোন সময়েই এরশাদকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা বা বিদায় জানাতে যাননি। সকলেই আশ্চার্য হয়ে দেখলেন, মঞ্জুর এবারই প্রথম এরশাদকে বিদায় জানাতে একই স্টাফকারে বসে বিমান বন্দরে গেলেন।

---

৮) মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৩৬।

৯) রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারা নেতৃত্ব, হীরা বুক মার্ট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৯শে মে (১৯৮১) জিয়া তাঁর দলের দুই বিবদমান গ্রুপের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত রাজশাহী যাত্রা বাতিল করে চট্টগ্রাম যান। উল্লেখ্য যে জেনারেল এরশাদের ও সফর সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল। বস্তুতঃ এরশাদের জন্য জিয়া বিমান বন্দরে প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করেন। পরে এরশাদ বিনীত ভাবে ফোনে রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, তিনি একটা বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। আগামী কাল সকালে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চট্টগ্রামে মিলিত হবেন। জিয়া যখন বিমানে চট্টগ্রাম উড়ে যাচ্ছিলেন তখন এরশাদ মঞ্জুরকে জানান যে, মঞ্জুর বিমান বন্দরে জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে যান এটা রাষ্ট্রপতি চান না। এতে মঞ্জুরের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেখা দেখা দেয়। বদলির কারনে বেসামাল মঞ্জুর এতে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন। তিনি তৎক্ষনাৎ রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সামরিক সচিব বলেন, রাষ্ট্রপতি যখন চান না তখন তার বিমান বন্দরে না যাওয়াই উচিত। মঞ্জুর এতে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন [১০] এরশাদ কৌশলে এই ধরনের একটি মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন এবং জিয়া ও মঞ্জুরকে পারস্পারিক অবিশ্বাস ও সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন। আর এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ২৯শে মে '৮১ চট্টগ্রাম সফরে যান এবং সার্কিট হাউসে অবস্থান কালে ৩০শে মে '৮১র কাক ডাকা ভোরে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী কিছু সৈন্যদের হাত নির্মম ভাবে নিহত হন।

জিয়ার মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার এর প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সাত্তার ও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ পূর্ণ সহযোগিতা করেন। যদিও সামরিক এলিটগণ শেষের দিকে জেনারেল জিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবু ও তারা তাঁকে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সামরিক ব্যক্তি বলে মনে করতেন। কিন্তু বিচারপতি সাত্তার এর বেলায় তাদের সেরূপ বিশ্বাস ছিল না।[১১] তবুও তারা নেপত্যে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাহায্য করেন।[১২] কারণ বি,এন,পির বিকল্প আওয়ামী লীগের দৃষ্টি ভংগী ও নীতি সামরিক বাহিনীর অনুকূল ছিল না। তাছাড়া বিচারপতি সাত্তার একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কোন শক্ত রাজনৈতিক সমর্থন ভিত্তি ছিল না। সামরিক এলিটগণ হয়ত ভেবেছিলেন যে, তাঁর অধীনে তাদের স্বার্থরক্ষা করা সহজতর হবে।[১২]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরপরই এরশাদ সামরিক আইন জারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সামরিক অফিসার এবং বিমানবাহিনী প্রধান সদরুদ্দীনের বিরোধীতার কারনে এরশাদ তা করেননি।[১৪] ক্ষমতা দখলের জন্য এরশাদের এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষ জানতেন না। বরং তারা জানলেন, জিয়া হত্যার পর এরশাদ ক্ষমতা দখল করতে পারতেন কিন্তু করেননি বরং সাত্তার সরকারকে কাজ করতে দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে আইন শৃংখলা এবং জিয়ার ভক্ত তা প্রমাণের জন্য জিয়াউর রহমানের লাশের সামনে দাড়িয়ে অশ্রুপাত করলেন এবং জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত কয়ে বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দিলেন। অন্য দিকে জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীকে

---

১০) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
১১) পিটার নেসওয়াল্ডের সংগে জেঃ এরশাদের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য ঃ The Holiday, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮১।
১২) The Holiday, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮১।
১৩) মওদুদ আহম্মদ এর সাথে সাক্ষাৎকার, ১লা অক্টোবর, ১৯৯৪।
১৪) মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭।
১৫) কয়েজ উদ্দিন আহমদ, পাঁচ দশকের স্মৃতি কথা, পদ্মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যান্টনমেন্টের দামী জায়গায় বাসার মালিকানা দেওয়া হলো। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সেনাবাহিনীর সুযোগ সুবিধা প্রভূত পরিমানে বৃদ্ধি করা হলো যে কারনে সিভিল সমাজে সেনাবাহিনী পরিচিতি হয়ে উঠলো লিমিটেড কোম্পানী নামে। সেনাবাহিনীতে এরশাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।[১৫] আর নেপত্যে চলতে লাগলো ক্ষমতা লোভী এরশাদের সামরিক আইন জারির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রথমেই তিনি দুটো কাজ সম্পন্ন করলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সাহায্যে। প্রথমেই সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারন করলেন। ১৯৮১ সালের ১১ই নভেম্বর একসঙ্গে উনিশ জন মেধাবী অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হলো। এর পর হুমকি দেখিয়ে প্রায় শতাধিক অফিসারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো। আর এভাবে মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া একটি সেনাবাহিনী পাকিস্তানপ্রত্যাগতদের নিয়ন্ত্রনাধীনে চলে গেল। দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনী অফিসার ও সৈনিকদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সুপারিশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করলো।

বিচারপতি সাত্তার ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ২৭শে নভেম্বর তিনি ৪২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। আর ২৯শে নভেম্বর সেনাবাহিনীর সমস্ত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এরশাদ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সাংবাদিকদের সামনে এরশাদ বিস্তারিতভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি "একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং তাঁর কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ নেই ..... সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক অ্যাডভেঞ্চার কামনা করে না। কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তারা রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চার চায় না। তারা কেবল গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে কোন ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়।[১৬] অথচ, এর পাঁচ মাস আগে জেনারেল এরশাদ এক সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন, নভেম্বরের বক্তব্য ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত, সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঃ

১। "৩০শে মে'র ঘটনাবলীতে দেশকে যে দুর্যোগময় পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তাতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার নির্দেশিত ভূমিকা পালনে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সেনাবাহিনীর প্রধান রূপে পরিতৃপ্ত সন্দেহ নেই ....."।

২। "সেনাবাহিনীর কখনও রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া উচিত নয় ..."।

৩। "একজন সচেতন নাগরিক রূপে সেনাবাহিনীর একজন সদস্যের রাজনীতিতে সচেতনতা বাঞ্ছনীয় কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করা নয়"।

৪। ""সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা ও দেশের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অনুগত থাকাই আমি প্রতিটি সৈনিকের কর্তব্য বলে মনে করি ....."।

৫। সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। সেনাবাহিনী রাজনীতিতে মাথা ঘামাবেনা। আমি মনে করি সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় আসার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটা উচিত নয় ....."।[১৭]

মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় এরশাদ তাঁর বক্তব্য পাল্টে ফেলেছিলেন।

---

১৬) ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবাম ঃ গণ আন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খন্ড, তোল পাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃঃ ৯।

১৭) বিচিত্রার সঙ্গে জেনারেল এরশাদের একান্ত সাক্ষাৎকার, বিচিত্রা, ১৯-৬-১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই শানিত ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্খা। স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের আবরনে ঢেকে আকর্ষনীয় করে তোলেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে Bangladesh Army Journal পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে জেঃ এরশাদ বলেন " আমাব সুস্পষ্ট দাবী, জাতীয় বাহিনী হিসেবে জাতির সমষ্টিগত উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত"।[১৮] জেঃ এরশাদ সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা যুদ্ধে ও জাতি গঠনে সামরিক বাহিনীর অবদানের উল্লেখ পূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের অংশ গ্রহনের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করে। ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাসে Peter Nies wand- র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেঃ এরশাদ দৃঢ়ভাবে বলেন "The army should be directly associated with the governance of the country which might fulifill the ambitions of the army and might not lead to further coups.[১৯] ১৯৮১ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বল্লেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংরক্ষরেন জন্যে সামরিক বাহিনীকে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান অনুমোদিত একটা ভূমিকা দিতে হবে।[২০] রাষ্ট্রপতি সাত্তার চাপের মুখে সেনা প্রধানের দাবী মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। জেঃ এরশাদ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে সরকার পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন জরুরী একারনে যে তাহলে সৈনিকেরা দেশ গঠনে প্রতি শ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং ফল স্বরূপ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইবে না।[২১] এমন সময়ে অবসর প্রাপ্ত জেঃ মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানি জেঃ এরশাদের সামরিকবাহিনীর ক্ষমতায় অংশ গ্রহনের দাবী প্রত্যাখান করে বিবৃতি প্রদান করলে অপর অবসর প্রাপ্ত জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দীন এরশাদের যুক্তি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু প্রায় সকল বিরোধী দল এরশাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে। এনিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মন্ডলে এক বির্তকের সৃষ্টি হয়। সে সময় সিভিল সমাজের পক্ষে বক্তব্য নিয়ে একমাত্র উপস্থিত হন শেখ হাসিনা ও সুপ্রীম কোর্টের ১৫৫ জন এ্যাডভোকেট। তাঁরা বিবৃতিতে বলেন "সরকার অথবা সেনাবাহিনীর কোন ব্যক্তির জাতীয় নীতি নির্ধারনের উপর কোন বিবৃতি প্রদান অথবা সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের এখতিয়ার নেই।" বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে এই অবধি ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই সেনাবাহিনীর এখন ক্ষমতা ভাগাভাগির দাবি খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রবেশ কোন গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই কাম্য হতে পারে না।[২২] এমতাবস্থায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি বলেন ; "দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ছাড়া সামরিক বাহিনীর অন্য কোন ভূমিকা থাকতে পারে না"।[২৩] এতে ও কিন্তু এরশাদ নিরস্ত হননি। বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতির ব্যখ্যা দেবার জন্যে জাতীয় পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে অবজারভার এবং হলিডেতে বলেন।" আমাদের অত্যন্ত উঁচু মানের সেনাবাহিনীকে দেশ রক্ষা ছাড়াও উৎপাদনমূখী ও জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে"। শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে এরশাদের বক্তব্য বিবৃতিতে তার দুটো সুবিধা হয়। যা বলার তাতো তিনি বললেন সাথে সাথে এমন ধারনা ও দিলেন, এ বক্তব্য তাঁর একার নয়। এ ব্যাপারে সমগ্র সামরিক বাহিনী তাঁর সাথে রয়েছে।[২৪]

---

১৮) এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৫৭।

১৯) The International Herald Tribune 27 August 1981.

২০) এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

২১) The Guardian (London). 7 October, 1981.

২২) ইউসুফ মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

২৩) D. Sen, "Bangla Army Chief issues on pole in Government. "The Hindustan Times, 22 November, 1981.

২৪) এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তাঁর সব সময়েই ছিল। মধ্য প্রাচ্যের দুবাই থেকে প্রকাশিত 'Gulf News' পত্রিকায় পাকিস্তানী সাংবাদিক মুসাহিদ হুসেনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বহু দিন পরে ঃ "যখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় তখন আমি ধৈর্য ধরেছি। তখন আমি ক্ষমতা দখল করিনি। সংবিধান অনুযায়ী আমি উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করার নির্দেশ দেই। তখন উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন হাসপাতালে।[২৫]

চতুর্থ সংশোধনী আইনের পর থেকে রাষ্ট্রপতির পদটি সাজানো হয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে। অসামান্য দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, ক্ষমতা প্রয়োগে পারদর্শীর যোগ্য হয়ে ওঠে সে পদ। প্রাজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপযোগী হয়ে উঠে সে পদ। বয়স, স্বাস্থ্য ও পেশাগত অভিজ্ঞতার কারনে বিচারপতি সাত্তার কোন দিন সে পদে স্বস্তি পাননি। বারে বারে তিনি হোঁচট খেয়েছেন। সমর্থন ও সহযোগীতার জন্যে তিনি তাকিয়েছেন এদিক ওদিক। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা তা লক্ষ্য করেন। ক্ষমতা দুর্গের সকল দরজার দিকে রাখেন সজাগ দৃষ্টি। বিচারপতি সাত্তারকে সামনে রেখেই তাঁরা নিপুন ভাবে ক্ষেত্র রচনা করেন। ক্ষমতা দখলের সব উদ্যোগ সম্পূর্ন করেন। সংবিধান অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয় এবং সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর। ঐ নির্বাচনে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ন হন। কোন প্রার্থী তাদের নিকট গ্রহনযোগ্য তা তারা খোলা খুলি বলেন, ইঙ্গিতে ও নয়। বিচার পতি সাত্তারও প্রথমে ছিলেন জেঃ এরশাদের প্রতি দুর্বল। নির্বাচনী প্রচারনায় নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আস্থাভাজন আমি। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ও শ্রদ্ধেয় আমি।[২৬]

নির্বাচনের পাঁচ সপ্তাহ আগে এরশাদ অনুভব করেন, নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেনের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভালো। তখন কোন ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী হননি। সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব দেবার ও উদ্ধত্য দেখান। বিচারপতি সাত্তার এ প্রস্তাব ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ভীষন উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, এ মুহূর্তেই তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাবেন![২৭] এরশাদ এরপর আর এগোতে সাহস পাননি। নির্বাচনের পরে ও জেঃ এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে শান্তিতে থাকতে দেননি। মাত্র চার মাসে তাকে সামলাতে হয়েছে চার হাজার ফ্রন্ট।[২৮] এরশাদ সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টি একটি রাষ্ট্রপতি কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। এ অবস্থায় সাত্তার এরশাদের দাবীর সঙ্গে তার নীতি মালার সমন্বয় সাধনে একমত হন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সম্ভবতঃ সেনা সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় টিকে থাকা নিরাপদ মনে করছিলেন না। এমতাবস্থায় একটা গ্রহনযোগ্য সমাধানে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রপতি সাত্তার জেনারেলদের সংগে আলোচনা শুরু করেন এবং ফল হিসেবে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় (১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী)। তিন বাহিনী প্রধান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বলেন, তারা যোগ দেবেন না কারন সেখানে সিভিলিয়ান মন্ত্রীদের সংখ্যা বেশী। এটি ছিল সিভিল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। প্রেসিডেন্ট সাত্তার দাবি মেনে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৬ করেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ মন্ত্রী সভার চেয়ে শক্তিশালী কোন সংস্থার ভূমিকা নিতে পারবে এ আশংকায় অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়ে।

---

২৫) এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, পৃঃ ৫৮।
২৬) ঐ পৃঃ ৫৮-৫৯।
২৭) ঐ পৃঃ ৫৯।
২৮) ঐ পৃঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী সংসদ অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল একটি Supra Government হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে অর্থাৎ সরকারের উপরে একটি সরকার খাড়া করে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচিত হয়নি। সে জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[২৯] এ সময় জেঃ ওসমানী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিপ্রায়ের নিন্দা করেন।

এরশাদ সেনাবাহিনীর আইনকানুন ও শৃংখলাকে দারুণভাবে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। তেজগাঁও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অপর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দান কালে দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবি করে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন।[৩০]

এরশাদের এসব কর্মতৎপরতায় রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সংগে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এরশাদ সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে উৎখাত করবেন। এ সংকটের নিরসন ও ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রের ধারা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। এরশাদকে বরখাস্ত করে তদস্থলে অপর একজন জেনারেলকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জেঃ সামসুজ্জামানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরীকে টেলিভিশন ও বেতারে এসংবাদ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন এবং মেজর জেঃ শামসুজ্জামানকে তাঁর নতুন নিয়োগের কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী জাতীয় সম্প্রচারে এ ঘোষনা দেয়ার পরিবর্তে এরশাদকে অবহিত করেন। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার কথা ছিল ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ। তা হয়নি। ২৪শে মার্চ এসেছিল বিচারপতি সাত্তারের পদত্যাগের খবর। ক্যাপ্টেন মোহাম্মাদ শহিদুল ইসলামের লেখায় ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চের নাটকীয় ঘটনার একাংশ ধরা পড়েছে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ঃ-

"স্থান সেনা সদর কনফারেন্স রুম। তারিখ ২৩শে মার্চ ১৯৮২। সময় রাত ৮-৩০ মিনিট। উপস্থিত আছেন অন্যদের মধ্যে জেনারেল রহমান, জেনারেল নূরুদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান (জি এম ও), ব্রিগেডিয়ার আমছা আমিন এবং ঢাকা ও অন্যান্য সেনানিবাসের গুটিকতক ব্যাটেলিয়ন ও ব্রিগেড কমান্ডার। নির্ধারিত সময়ে কনফারেন্স কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনা প্রধান এরশাদ। ভীষন উত্তেজিত মনে হলো তাকে। কুঞ্চিত কপালের বিস্তৃত অবয়ব জুড়ে মৃদু ঘামের ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুপাত সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উপস্থিত সকলকে জানালেন এরশাদঃ জিয়ার মৃত্যুর পর দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কি আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়েছি আমি। তারও আগে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ও সংহত করতে কিনা করেছি আমি। তুলনাহীন আনুগত্য ও ত্যাগের মাধ্যমে আমি সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনী ও জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। অথচ আজ রাষ্ট্রপতি সাত্তার রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত কথাবার্তা নিয়ে বরখাস্ত করতে চাচ্ছেন আমাকে।"[৩৩]

---

২৯) তৎকালীন সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য। দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪-০১-১৯৮২।

৩০) লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি গার্ডিয়ান ৭ই অক্টোবর, ১৯৮১, ও নিউইয়র্ক টাইমস্, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮১ সংখ্যায় এরশাদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

৩১) সাক্ষাৎকার ঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, (জাতীয় সংসদের উপনেতা) ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

৩২) মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

৩৩) ঐ পৃঃ ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারীর কারন

সামরিক অভ্যুত্থান কোথাও অকস্মাৎ ঘটে না। অভ্যুত্থানের পূর্বে কত গুলো লক্ষন সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, তীব্র অসন্তোষ, দলীয় পর্যায়ে অসহিষ্ণুতা, সরকারের অগনতান্ত্রিক কার্যক্রম, সামাজিক অস্থিরতা ব্যাপক ভিত্তিক হয়ে উঠে। একটা সচেতন নিরীক্ষার পরেই অভ্যুত্থান ঘটে। ঘটে এমন সময় যখন সামরিক কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন যে সামরিক শাসন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির বেশ কিছু দিন আগে থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ড, বিচারপতি সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বি, এন, পির প্রকাশ্য চরম অন্তদ্বন্দ্ব, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি প্রেক্ষাপট রচিত হয় সামরিক শাসনের পক্ষে।[৩৪]

তবে কোন দেশে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বিতীয়তঃ সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ। তৃতীয়তঃ দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অবস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্দল ও দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক এলিটদের জনপ্রিয়তা হ্রাস।[৩৫] ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ বাংলাদেশের সামরিক শাসন জারীকে এই প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমতঃ বাংলাদেশে সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্ম্পকে অত্যন্ত সচেতন তা প্রমানিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট, ৩রা নভেম্বর, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবর ও ১৯৮১ সালের ৩০শে মে'র অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায়। এই সকল অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটি সংঘটিত হয় সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। ৩০শে মে'র ঘটনা এই দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এই ঘটনার পর সামরিক বাহিনীতে মুক্তি যোদ্ধাদের প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সার্বিক স্বার্থ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সহিত জড়িত থাকে । বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শাসনামলে সামরিক বাহিনীর স্বার্থ বিভিন্নভাবে ব্যাহত হয়। মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম লাভ করলেও এই দল কোন সময় একটি সুসংহত দলে রূপান্তরিত হয়নি। জন্মক্ষন হতে এই দল ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু সংখ্যক নেতার সম্মিলিত প্ল্যাটফরম মাত্র। পিকিংপন্থী জাতীয় আওয়ামী পার্টির একাংশ, মুসলিম লীগ, ইউ, পি,পি, দলের কিছু নেতা, বাংলাদেশ শ্রমিক দলের কিছু কর্মী এবং তফসিলী ফেডারেশনের একাংশের সহযোগে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলটি দু'টি সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার আকর্ষন।[৩৬] জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাই জাতীয়তাবাদী দলে অন্তদ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারন করে। দলীয় সংহতি রক্ষার্থে বিচার পতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে হয়, যদিও বয়স ও কর্ম ক্ষমতা কোন দিক থেকেই তিনি রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন না। কারন তাঁর বয়স ৭০ এর অধিক ছিল। সর্বক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর পক্ষে সকল সমস্যা পর্যবেক্ষন করা খুব দুরূহ ছিল সুতরাং শক্তভাবে শাসন

৩৪) অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৩৯।
৩৫) অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৭০।
৩৬) ঐ পৃঃ ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা প্রয়োগ করা ব্যক্তি হিসেবে সাত্তারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের পর মন্ত্রিপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দল আর ও বৃদ্ধি পায়। দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। জিয়া সরকারের বেশীরভাগ সদস্যদের সততা সম্পর্কে জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্রীর দূর্নীতির বিষয়ে অনেক তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রীপরিষদে যোগদানের পর অনেকেই দূর্নীতির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বমোট ১৪ জন মন্ত্রীর দূর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। এসব মন্ত্রীদের মন্ত্রী পরিষদে যোগদানের আগে বাড়ি, গাড়ি বা অর্থ সম্পদ কিছুই ছিল না। মন্ত্রীদের এই ব্যাপক দূর্নীতির বিষয়টি প্রকাশিত হলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়া দুটি গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু গোয়েন্দা রির্পোটের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহনের আগেই তিনি নিহত হন। বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর পরই এই তদন্তকার্য সমাধা করার নির্দেশ দেন।[৩৭]

এই সময় যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের মিন্টু রোডস্থ সরকারী বাসভবনে একটি চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয় ঘন্টাকাল যুবমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে বিকেল চারটায় উদ্ধর্তন প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুলিশ নাখাল পাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামী এমদাদুল হক (ইমদু) কে গ্রেফতার করে। ইমদুকে গ্রেফতারের আগে পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র সাদা পোশাকধারী লোকেরা আশে পাশের বাড়ির ছাদ, গ্যারেজ ও প্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়ে সকল দর্শটা থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। এই এলাকায় অবস্থিত কয়েকজন বিচারপতির বাড়ীর আঙ্গিনায় ও ছাদে পুলিশ অবস্থান গ্রহন করে। যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল মতিনের সঙ্গে আলোচনার পরে ইমদুকে গ্রেফতারের অনুমতি দেন; যুবমন্ত্রীর আপত্তির মুখে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুমতিক্রমে ইমদুকে গ্রেফতার করেন।[৩৮]

এই ঘটনায় ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। মন্ত্রীর বাসভবনে আশ্রয়লাভকারী এই ধরনের একজন খুনীকে গ্রেফতারের ফলে মন্ত্রীসভা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে স্বগঠিত মন্ত্রীসভার সততা, আনুগত্য, ন্যায় পরায়নতাও দেশপ্রেম সম্পর্কে জনগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। মাত্র ৪ মাস সময়ের মধ্যে সাত্তার কর্তৃক দুইবার মন্ত্রীপরিষদ গঠন এই সরকারের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। এই সময় দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। বিচারপতি সাত্তার নিজেই বলেন যে, "সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের অনেকেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা ও দেশের মংগলা মংগল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা এবং দূর্নীতি পরায়নতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবনতি ঘটেছে"।[৩৯]

পর্যুদস্ত জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারীতে (৮২) মাত্র ১৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। এসব কারনে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী কাটছাট করতে হয়। দেশের সর্বস্থানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে, চট্টগ্রামের সি এস ডি গুদাম থেকে কোটি টাকার খাদ্যশস্য উধাও হয়ে যায়।[৪০]

---

৩৭) রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।
৩৮) অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।
৩৯) ঐ পৃঃ ৪৭৩।
৪০) ঐ পৃঃ ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এসব খাদ্যশস্য পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলে জনমনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ভাবে দেশে দ্বিতীয় বার সামরিক শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাসন ব্যবস্থায় বে-সামরিকীকরনের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা ছিল সামরিক ও বে-সামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে। ফলে সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিলেন। বি,এন,পি, সরকারের দূর্বলতা ও জন প্রিয়তা হ্রাসের সুযোগে এরা প্রকাশ্যভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৮২ সালের সামরিক আইন জারীর ঘোষনা পত্রে জেনারেল এরশাদ উল্লেখ করেনঃ যেহেতু দেশে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বে-সামরিক প্রশাসন আইন কার্যকর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সকল স্তরের সীমাহীন দূর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে উঠায় জনগনের জন্য দুর্বিসহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি। সম্মান জনক জীবন যাপন, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। যেহেতু দেশের জনগন চরম দিশেহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব বোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তেছে। যেহেতু আমি লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগনের আর্শীবাদ নিয়ে ২৪শে মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহন করছি এবং এমুহূর্ত থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভূক্ত বলে ঘোষনা করছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন গ্রহন করছি।[৪১]

ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ২৫শে মার্চ অপরাহ্নে রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষনে সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করে বলেন যে, দেশের আইন শৃংখলা, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[৪২]

জেনারেল এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারীর পক্ষ সমর্থন করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষনের কথা উল্লেখ করেন। যাতে তিনি বলেছিলেন ঃ "সমাজ জীবনে আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা তার তত বেশী প্রতিপত্তি। সমাজে যারা সৎ ও ভাল মানুষ তারা বড় অসহায় অবস্থায় কাল কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভাল মানুষেরা জন জীবন থেকে

---

৪১) Martial Law proclamation order, Registered No. DA-1. The Bangladesh Gazette Extraordinary published by Authority. Wednesday. March 24, 1982.

৪২) দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫-০৩-১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে সমাজে অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের দাপট ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের এমন এক ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে যে, সাহসিকতার সংগে এর মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়বে"। জেনারেল এরশাদ বলেন, জাতির এ দুর্যোগ দিনে সেনাবাহিনী নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আর তাই সামরিক শাসন হয়ে পড়েছে অত্যাবশ্যক।[৪৩]

এতক্ষন ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারীর কারন সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য বর্ণনা করা হল। কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে এ সামরিক শাসন জারীর কারণ সম্পর্কে আর ও যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই এরশাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন আর তাই সুযোগ বুঝে নানা কারন উপস্থাপন করে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে অপসারন করে ক্ষমতা দখল করেন অর্থাৎ ক্ষমতার মোহইছিল ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারীর প্রধান কারন।[৪৪]

২। ক্ষমতাসীন বি,এন,পি সরকারের দূর্বলতা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং ক্ষমতাসীন সরকারের অদূরদর্শিতাই রাজনীতিতে সামরিক শাসন আগমনের প্রত্যক্ষ কারন বলে প্রতীয়মান।[৪৫]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মোহ থেকেই রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের আগমন ঘটে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি চরম পর্যায়ে পৌছতে থাকে তখন সেনাবাহিনীও ব্যারাকে বসে থাকে না, তারা রাজনীতিতে নিজেদের অধিকার দাবী করে এবং পরবর্তীতে দেশরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে রাজনীতিতে আবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আমরা বে-সামরিক সরকারের ব্যর্থতাকে ও চিহ্নিত করতে পারি এবং বাংলাদেশে পর পর সামরিক অভ্যুত্থান এবং ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে এ সকল কারন ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু ১৯৮২ সালের অভ্যুত্থানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি সুপরিকল্পিত। এর আগে বাংলাদেশে যে সব অভ্যুত্থান ঘটেছে সে গুলোর মত হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অভ্যুত্থান এটি নয়। সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায়, লাভ লোকসানের মূল্যায়ন করেই এর পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া, এ অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিণীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল, তার অনেকগুন বেশী ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা,জেনারেল এরশাদের উচ্চাভিলাষ।[৪৬]

---

৪৩) নূরুল ইসলাম, (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) এর ভাষন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন অভিষেক অনুষ্ঠান ১৬ই মার্চ, ১৯৮২।

৪৪) সাক্ষাৎকার গ্রহন ঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

৪৫) সাক্ষাৎকার গ্রহন ঃ মোহাম্মদ হানিফ, ৬ই অক্টোবর, ১৯৯৪।

৪৬) অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসনামলে গৃহীত প্রাথমিক কর্মকান্ড

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারীর অব্যবহিত পরেই লেঃ জেঃ হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষনা করেন। জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষনে তিনি কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষনা করেন। সিদ্ধান্ত গুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। সংবিধানকে স্থগিত ঘোষনা করা হয়।
২। জাতীয় সংসদকে ভেঙ্গে দেয়া হয়।
৩। মন্ত্রী সভাকে বাতিল করা হয়।
৪। সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।
৫। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
৬। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা।
৭। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার কাজে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।
৮। সময়ে সময়ে জারীকৃত সামরিক বিধির সাহায্যে দেশ শাসন করা হবে।

382788

এই ঘোষনা অনুযায়ী জেঃ এরশাদ সরকার ও শাসন ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। জেঃ এরশাদ সমগ্র দেশকে পাঁচটি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং পাঁচ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশাসনকে আর ও দক্ষ ও নিপুন করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। প্রথমে উপদেষ্টা বৃন্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরে এর সদস্য সংখ্যা হয় ১৪।

ইতিমধ্যে সরকার তাঁর কতিপয় প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। দেশকে সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।
২। সর্বগ্রাসী দূর্নীতির কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করা ।
৩। সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৪। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের ধ্যানধারনার কার্যকর প্রতি ফলন ঘটিয়ে গনতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।
৫। সুখী ও সমৃদ্ধশীল এবং শোষন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
৬। একটি কর্মক্ষম ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা যা জনগনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।
৭। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আপামর জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।
৮। একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে অসৎ রাজনীতির শিকার হতে পরিত্রান দেয়া।
৯। বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ ও দ্রুত বিচার কার্য সম্পাদন।
১০। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার পর জেঃ হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ জনগনের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তার সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষনা করেন। এ দফা গুলো নিম্নরূপ ঃ

১। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল লাভ করা।
২। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদের সমবন্টন করা।
৩। গ্রামীন উন্নয়ন সাধন করা।
৪। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বন্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি।
৫। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৬। কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাদের জীবন যাত্রার নিরাপত্তাবিধান পূর্বক ভূমি সংস্কার সাধন।
৭। পল্লী এলাকায় গ্রামীন ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে পুজি বিতরন ও সরবরাহ করা।
৮। বেসরকারী খাতের শিল্প সমুহকে উৎসাহ দান ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৯। সমবায় ও কুঠির শিল্পের উন্নয়ন।
১০। প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুন বিন্যাস এবং এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃচ্ছতা সাধন করা ।
১১। ছাএদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা বিধান পুর্বক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
১২। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা ।
১৩। জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতায় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে মহিলারা যাতে সমাজে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করা।
১৪। জনগনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা প্রদান ।
১৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা।
১৬। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করা ।
১৮। জাতীয় জীবনে ইসলামী মুল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজেদের ভাষা সৃষ্টি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা ।[৪৭]

এরশাদের বে-সামরিকীকরন প্রক্রিয়া

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ক্ষমতা দখলের পরই জেঃ এরশাদ ঘোষনা করেন বাংলাদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য । তিনি তার সামরিক শাসনকে জনগনের সামরিক শাসন রূপে আখ্যায়িত করেন। তাই তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। বে-সামরিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল এরশাদের সামরিক সরকার "ঘরোয়া রাজনীতির" অনুমতি দেন।

৪৭) মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিকউন্নয়ন, পৃঃ ২৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী প্রক্রিয়া

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন

জেনারেল এরশাদ এই লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে। তাছাড়া, ৭৬টি পৌর সভা ও ৩টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গণ ভোট ঃ মার্চ, ১৯৮৫

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮৫ সালের ১লা মার্চ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং তাঁর কর্ম সূচীকে জনগণ সমর্থন করেন কি না তাহা যাচাই এর জন্য ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ এক গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই গণভোটে নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী দেশের ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ১০ হাজার ৯১৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৪০ জন এই গণভোটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তার মধ্যে এরশাদ ৯৪.১৪% হাঁ সূচক ভোট লাভ করেন।

উপজেলা নির্বাচন মে, ১৯৮৫

সরকার ১৯৮৫ সালের মে মাসে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। দুটো পর্যায়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৬ই মে দেশে ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ২৫১টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ২০৭ টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০শে মে। উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে যদিও নির্বাচনী গোলযোগ, পুলিশের গুলি বর্ষন, সংঘর্ষ ঘটে তবু ও শেষ পর্যন্ত ২২ মে' মাসের মধ্যে সব স্থগিত কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হয়ে যায়। বিভিন্ন উপজেলার ফলাফল বিশ্লেষণ ভাবে জরীপ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, শতকরা ৩৩ জন ভোটার প্রকৃত পক্ষে ভোট প্রদান করেন।

দল গঠন প্রক্রিয়া

এরশাদের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার আর একটি উপাদান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি রাজনৈতিক দলগঠন। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে জনদল নামে একটি নতুন দলের জন্ম হয়। এসময় একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়। জনদল, বি,এন,পি, (শাহ), মুসলীম লীগ (সিদ্দিকী), ইউ পি পি ও গণতান্ত্রিক পার্টি মিলে এ জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়।

১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। এ সময় জাতীয় পার্টি নামে নতুন সরকারী দলের জন্ম হয় এবং জনদল বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। এভাবে ১৮ দফা বাস্তবায়ন কামাট থেকে জনদল, জনদল থেকে জাতীয় ফ্রন্ট, ফ্রন্ট থেকে জাতীয় পার্টিতে উত্তরন ঘটে গেল। ১২ই জানুয়ারী বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় এরশাদ ঘোষনা করলেন, "জাতীয় পার্টির সংগে আমার রাজনৈতিক সমন্বয় ঘটেছে"।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ৭ই মে, ১৯৮৬

১৯৮৫ সালের গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমিত পর্যায়ে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের প্রথম থেকে অবাধ রাজনৈতিক আশ্বাস দিয়া রাষ্ট্রপতি দেশে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করেন ২৬শে এপ্রিল। পরে কিছু সংখ্যক বিরোধী দলের অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৮৬ সালের ৭ই মে এবং ঐ দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৬ সালের এ সংবাদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ২১০৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ যেন ১৫২৭ জন। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয় লাভ করে সংখ্যা গরিষ্ট দল হিসেবে গণ্য হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ ১৫ ই অক্টোবর, ১৯৮৬

১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলকে বৈধ করার ক্ষেত্রে চতুর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা চলে। ১৯৮৬ সালের ১৫ ইং অক্টোবর তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর। এরশাদ লাভ করেন ২,১৭, ১৭,৭৪৪ ভোট। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ তার শাসনামলকে সম্পূর্ন রূপে বে-সামরিকীকরণ করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৬

১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর জাতীয় সংসদের ৬ ঘন্টা স্থায়ী ১ দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিধান (৭ম সংশোধনী) আইন প্রণীত হয়। ৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ২২৩ জন সদস্য (জাতীয় পার্টি ২০৮, মুসলিম লীগ ৪, জাসদ (রব) -৪, জাসদ (সিরাজ) -৩, বাকশাল -২ এবং স্বতন্ত্র -২) এই আইনের পক্ষে ভোটদান করেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর সরকার ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত যে সকল বিধি বিধান ও সামরিক আইন জারি করেছেন এবং ঐ সকল বিধি বিধান ও সামরিক আইনের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করেছেন সে গুলোর বৈধতা দান করা এবং সব কিছুকে সংবিধানের অনুভূক্ত করা। এরপর ঐ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালতে কোন মামলা করা চলবে না। সামরিক শাসনকে বে-সামরিকীকরণই ছিল এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য।

সামরিক আইন প্রত্যাহার

তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সপ্তম সংশোধনী আইন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ক্ষেত্র তৈরী হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষনে ১৯৮৬ সালের নির্দেশ দেন। ফলে যে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তার অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে (৮২-৯০) সময়ে সমাজের বিভিন্ন সেকটরের দৃশ্য পট

বংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই সময়ে সামরিক সরকার অথবা সামরিকবাহিনী সমর্থিত স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতাসীন থাকার ফলে জাতীয় জীবনে এক অন্ধকার দুর্যোগের সূচনা হয়। দীর্ঘ ৯ বছরে স্বৈরশাসন তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয় এদেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক মূল্যবোধ। গণতন্ত্র বিকাশের পথে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। ব্যক্তির উচ্চাশা, দলীয় সংকীর্নতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এ সময়ে গণতন্ত্রের ভীতকে শক্তিশালী হতে দেয়নি। কারণ এ সময়ে স্বৈরশাসন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঘটেছে চরম অবক্ষয় এবং সমাজের সর্বস্তরেই গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রক্রিয়া হয়েছে শুরু।

ক্ষমতা দখলের পর সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারের জন্য বাংলাদেশে যত ধরনের বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান ছিল তা হিসেব করে ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। এ সব প্রতিষ্ঠান যে সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিল না বলাই বাহুল্য। এসব প্রতিষ্ঠান সবে মাত্র গড়ে উঠেছিল।[১] এ লক্ষ্য অর্জনে গত এক দশক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিনি কাজ করে গেছেন। ফলে সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে উঠেছে অনেক অভিযোগ। তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে বিধ্বস্ত করেছেন, লুন্ঠন করেছেন জাতীয় সম্পদ। অমার্জনীয় অপচয় ঘটিয়েছেন বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনের ভাবমূর্তি অবনত করেছেন। ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে শেষদিন পর্যন্ত তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বন্দী করে রেখেছিলেন নিজস্ব খেয়াল খুশীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে। তিনি গণতন্ত্রের সব বাতায়ন বন্ধ করেই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন করেছেন। এই সময়ে রাজনীতি হয়ে পড়েছিল ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও কূটকৌশলের নিশ্চিদ্র দুর্গে বন্দী। ফলে তা দিকে দিকে সৃষ্টি করেছে হাজারো সমস্যা। নির্বাচনের মত প্রতিষ্ঠান হারায় তার সত্তা, বিশ্বাস যোগ্যতা এবং নৈতিকমান। কারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরশাদ সরকার নির্বাচন প্রথাকে এমন ভাবে বিনষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন যে, সিভিল সমাজের যেন সম্পূর্ন আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে এবং তারা নির্ভর করে সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর। রাষ্ট্র ও সমাজকে সামরিকীকরণ করতে গিয়ে যাবতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। করেছেন সংবিধানের বিকৃতায়ন। এরশাদ পার্লামেন্টকে পৃথিবীর একমাত্র ভোটারবিহীন পার্লামেন্টে পরিনত করেছিলো। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলো পার্লামেন্ট থেকে। পুরো অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক শৃংখলা সম্পূর্নভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। রাষ্ট্র ও নিজের তল্পীবাহকদের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। স্বাধীন বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে জনগণকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনগুলোয় সন্ত্রাস, সেশনজটের জন্ম দিয়েছিল এবং শিক্ষার পরিবেশ একেবারেই ছিল না। এক ব্যক্তির স্বৈরশাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংবিধানকে স্থগিত করার নামে সংবিধানকে স্তব্ধ ও কলুষিত করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। ফলে দেশে যত প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলোতেই পাওয়া যাবে স্বৈরশাসনের হস্তক্ষেপের কলংকাকীর্ন নিদর্শন। এই সময়ে কারো কাছে জবাব দিহির বালাই ছিল না। জবাব দিহির প্রথাটা একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। কারণ এরশাদের ক্ষমতার উৎস জনগণ ছিল না। ফলে এই সময়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল সর্বত্র।

---

১) মুনতাসীর মামুন, গণ আন্দোলনের পটভূমি, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, স্বৈরাচার বিরোধী অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিকধারা ধ্বংসের ফলে প্রশাসন সহ সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজসহ সার্বিক ভাবে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল জটিল। পুরো সময়টাই রাজনৈতিক ভাবে হয়ে ওঠেছিল নিষ্ফলা এবং অপচয়ের। গণতন্ত্র এখানে বন্দী থাকে ইতিপূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী। ফলে এই সময়ের বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল গণতন্ত্রবিহীন এক অন্ধকার যুগে। যে গণতন্ত্রহীনতার মাত্রিকতার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না, বরং তা ব্যপ্ত হয়ে পড়েছিল সামাজিক বলয়ের প্রতিটি অঙ্গনে।

এই অধ্যায়ে (৮২-৯০) সময়ের এমনি কতিপয় দিকের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। সামরিক ও স্বৈরশাসনের কবলে পড়ে সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থা কি দাড়িয়েছিল তা বিশ্লেষন করা হয়েছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে-সব অগনমূখী মাত্রিকতা জন্ম লাভ করেছিল তা চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারনে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে যেমন - আমলা ব্যবস্থায়, সামরিক বাহিনীতে, রাষ্ট্র ও প্রশাসনে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে ধস নেমেছিল ব্যাপক বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে সমাজেব বিভিন্ন সেক্টরের চিত্র সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। খন্ড খন্ড এসব চিত্র জনগণের বিভিন্ন অংশের কাছে আপন স্বার্থ ও অবস্থান অনুযায়ী গুরুত্ব পাবে।

রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের (৮২-৯০) এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে কোন বিশ্লেষন করতে গেলে থমকে দাঁড়াতে হয়। কারণ এই সময়ে রাজনীতির অনিশ্চিত গতি প্রকৃতি, চাল চিত্র এমন একটা জটিল ও এলোমেলো অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে সহসাই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে একনজর তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কি ভয়ানক অস্থিতিশীলতার ভেতর দিয়ে এই সময়ে দেশ এগিয়েছে। এই রোদ এই বৃষ্টির মত রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করেছে।

জেঃ এরাশাদ কর্তৃক ৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত এবং সামরিক ও স্বৈরশাসনের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে শুরু হয় কালো মেঘের ঘনঘটা। এরশাদ সরকার বাংলাদেশ শাসন করেছেন প্রায় নয় বছর। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত শাসন করেছেন সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে। ১৯৮৬-৯০ প্রেসিডেন্ট হিসেবে।[২]

রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিধারায় এই সময়ের রাজনীতি দুই ধারায় বহমান ছিল। একটি সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের সিভিলসমাজে বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টার রাজনীতি। অপরটি বিরোধী জোট ও দলগুলোর সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সিভিলসমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। সামরিক শাসক ওরাষ্টপতি এরশাদ দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে থেকে নির্বাচিত হয়েছেন দশকের আলোচিত চরিত্রে। ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে ক্ষমতার আসন পাকা পোক্ত করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে, বিরোধী রাজনীতির উপর দমন পীড়ন ও নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে বিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করে, সুকৌশলে সামরিক বাহিনীর সমর্থনে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার গৌরব অর্জন করে আলোচিত চরিত্রে পরিণত হন।

---

২) ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবাম ঃ গণ আন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খন্ড, তোলপাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক তেমনি বিরোধী রাজনীতিতে এই সময় পারিবারিক উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে আগমন ঘটে আন্দোলনের ফসল হিসেবে দুই রাজনৈতিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে দুই নারীর। মূলত ঘটনা ও পরিস্থিতির কারনে এই দুই নারী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধান দুই বিরোধী রাজনতিক দলের (আওয়ামী লীগ ও বি,এন, পি) নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। পুরুষ শাসিত সমাজে এবং বিশেষ ভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে নিজেদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এই দুই নারী বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। রাজনীতি নির্ধারনের ভূমিকা গ্রহন করে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা গৃহবধুর নরম ভাব মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেললেন। আর্বিভূত হলেন লড়াকু রাজনৈতিকনেত্রী হিসেবে। দখল করে নিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। রক্ষনাত্মক ভূমিকায় থাকার কারনে এরশাদ রাজনীতিব ক্ষেত্রে ততটা আলোচিত নন যতটা হয়েছেন খালেদা ও হাসিনা তাদের আক্রমনাত্মক অবস্থানের কারনে।

এই সময় সামরিক শাসন রাজনীতিতে প্রবেশ করার দরুন রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করে। জেঃ এরশাদ রাজনীতিতে জড়িত হবেন না প্রতিশ্রুতি দিলে ও পরিকল্পিত ভাবে রাজনীতিতে এসেছিলেন ক্ষমতা দখলের মাত্র বছর দেড়েক সময়ের মধ্যেই। এলক্ষে একটি বে-সামরিক লেবাস প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। তিনি বার বার জনসাধারনকে আশ্বাস দেন যে গণতন্ত্র পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তদুপরি তিনি রাজনীতিকে রাজনৈতিক উপায়ে মোকাবেলা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[৩] জেঃ এরশাদের সমর্থকদের সংহত করার প্রয়াস হিসেবে জাতীয় পার্টির আত্ম প্রকাশ ঘটে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীমাসে। এরশাদ নিজেই এর নেতৃত্ব গ্রহন করেন। এভাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং সামরিক শাসনের একটি বে-সামরিক লেবাস তৈরী করেন। যেমনটি করেছিলেন জেঃ জিয়া বি,এন,পি, গঠনের মাধ্যমে। আর এসবই করা হয়েছিল সরকারের জনবিচ্ছিন্নতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কিন্তু দেশের কোন একটি প্রধান রাজনৈতিক ধারাকে ও সরকার সমর্থক রাজনীতিতে শামিল করা যায়নি। জেঃ এরশাদের সামরিক সরকারের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত ইঙ্গিত করে যে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তাঁর জাতীয় পার্টিকে ও তল্পিবাহকের ভূমিকা ব্যতীত আদর্শ ভিত্তিক একটি সুশৃংখল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন।

প্রথম থেকেই এরশাদের ক্ষমতা দখলকে কোন রাজনৈতিক দলই স্বাগত জানায়নি। তাই বিভিন্নভাবে চলতে থাকে এর বিরোধীতা। এরশাদের ক্ষমতা দখলের এক বছর পর ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষনের ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি। একটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট আর একটি বি,এন,পির নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট। এই দুটি জোট ও অন্যান্য ছোট-ছোট দল গুলো সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ দফা দাবী পেশ করে। ৮৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দুটি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ৫ দফার অভিন্ন কর্মসূচী। সেই থেকে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ৫ দফার এই আন্দোলন পরে ১ দফার আন্দোলন অর্থাৎ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে পরিচালিত আন্দোলন বিরোধী জোটের প্রভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

৩। ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এরফলে এরশাদ ক্ষমতায় আসার অল্প দিনের মধ্যেই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তীব্র রাজনৈতিক বিরোধীতার মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর ৯ বছরের শাসনকালের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোর উত্তাল আন্দোলন আর সরকারের পদত্যাগের দাবীর মধ্য দিয়ে। এত দীর্ঘ ও এত তীব্র আন্দোলন, রক্তপাত আর হরতাল স্বাধীনতা পরবর্তী অন্য কোন সরকারের আমলে হয়নি। প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিরোধীতার মুখে এত গণ বিচ্ছিন্নতা ও আর কোন সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

বিরোধী জোট ৫ দফার ভিত্তিতে প্রবল যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুললেও জোটের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। ফলে সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে কৌশলগত মৌলিক পার্থক্যের কারণে দুই বৃহৎ দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। জেঃ এরশাদ এক সাক্ষাৎকারে এই বিভেদকে ব্যখ্যা করেছেন এভাবে ঃ "যখন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা চান সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এরশাদকে, তখন বি এন পি নেত্রী খালেদা জিয়া চান এরশাদ বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীকে"।[৪] অনেক সময় বিরোধী দল গুলোর মধ্যে অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ও একসা চলানীতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে ষড়যন্ত্রের আবহে রাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়। মূল জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে কোন সমঝোতা ছিল না। অনৈক্য, পারস্পারিক কাঁদাছোঁড়াছুড়ি, কলহ, দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের মধ্যে নিপতিত হয়। একনেত্রী অন্য নেত্রীকে, এক দল অন্য দলকে, এক জোট অন্য জোটকে দোষারোপ করে এত বেশী সময় ও বাক্য ব্যয় করে যে, গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য কী করণীয়, সে বিষয়ে জনগণের সামনে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা দিতে পারেনি। এই অবস্থা রাজনীতির সংকটকে আরও স্পষ্ট ও দীর্ঘ করে তোলে। দুই বিরোধী জোটের দুই নেত্রী একে অপরের বিপক্ষে ছিলেন সোচ্চার। আন্দোলনের মধ্যভাগে এসে বক্তৃতা, বাদপ্রতিবাদে মুখর করেছেন রাজপথ ও ময়দান। সরকারকে পাশ কাটিয়ে পক্ষ বিপক্ষ সংগঠিত করেছেন নিজেদের মধ্যে। ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে স্থবিরতা নেমে আসে। সরকার থাকে প্রতি পক্ষহীন। সরকার বিরোধী আন্দোলন থাকে স্থবির, বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত। সামগ্রিক ভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধীতার প্রতিপক্ষ থাকে তারা নিজেরাই সরকার নয়। একজন বাংলাদেশী পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন যে, বি এন পি ও আওয়ামী লীগ যত টুকু এরশাদের পতন চেয়েছে তার চেয়ে বেশী তারা একে অপরের ধ্বংস কামনা করেছে।[৫] ডঃ ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, ১৯৮২ সালে হাসিনা বিবৃতি দেন ৩৫০টি এবং খালেদা ৪০০টি। এগুলির প্রায় সবগুলোতেই করা হয় পারস্পরিক সমালোচনা। এসব সমালোচনার ভাষা ছিল শক্ত ও বিদ্বেষমূলক। আবার কখনও ঐক্যের আহবান ও উচ্চারিত হয়। তবে ঐক্যের সব আহবানই ছিল শর্তযুক্ত। শর্তপূরণ করে না কেউ। ..... এরশাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে ও বেশ উত্তপ্ত বিতর্ক হয় দুই নেত্রীর মধ্যে। দু'জনেই একে অপরকে স্বৈরাচারের দোসর বলে অভিহিত করেন।[৬] এরশাদের ভিত্তি দুর্বল হওয়া সত্ত্বে ও বিরোধী দলগুলোর এ অন্তদ্বন্দ্ব তিনি কাজে লাগান। সমঝোতা ও ঐক্যের বদলে তারা জনগনকে উপহার দেয় কলহ, ভাংগন, সংঘাত ও হানাহানি, ভুল বোঝা বুঝি, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র যা জাতীয় রাজনীতিকে ঠেলে দেয় কপমুন্ডকতার মধ্যে। দুই দলের মধ্যে এই দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত ছিল সরকারের জন্যে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি। তাই সরকারের লক্ষ্য ছিল পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে আরো প্রসারিত করে দেয়া; সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জিত হয় এক্ষেত্রে। এই সুযোগে সরকার তার শক্তি সংহত করে দেশে বিদেশে গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। সরকার তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ড দ্বারা বিরোধী রাজনীতির গতিপ্রকতিকে প্রভাবিত করে পরোক্ষভাবে হলে ও এক ধরনের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে।

---

৪) গোলাম হোসেন সম্পাদিত, বাংলাদেশ ঃ সরকার ও রাজনীতি, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯২, পৃঃ ২০৩।

৫) গোলাম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩।

৬) ডঃ ওয়াজেদ মিয়া, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী জোট ও দলগুলো এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে বক্তৃতা বিবৃতিতে যতটা দৃঢ়তা ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে ততটা কার্যকরী কোন কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আলোচ্য সময়ে বিরোধী দল গুলো যে সব কর্মসূচী ঘোষনা করেছে মনে হয় তারা সেটাকেই চূড়ান্ত কর্মসূচী বলে ধরে নিয়েছিল। তাদের হয়ত ধারনা ছিল যে ঐ কর্মসূচী সফল হলেই সরকারের পতন ঘটবে। কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে যে সরকার ক্র্যাক ডাউন করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন রাজপথ থেকে উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোন ফলোআপ কর্মসূচী ছিল না। ফলে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে আবার বিরোধী দলের মাঠে নামতে হয়েছে। আর এর সুযোগ নিয়েছে সরকার। ফলে এই ৯ বছরের রাজনীতি ছিল নরম গরমে মিশ্রিত। সরকার কখনো কঠোর হয়েছে আবার কখনো নমনীয় হয়েছে। কঠোর নমনীয় পদ্ধতিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি সংকট কাটিয়ে উঠেছেন সত্য কিন্তু সবার কাছে গ্রহনযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান দিতে পারেননি। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি সরকার বিরোধী যুক্ত আন্দোলনে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হলেও একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে আসতে পারেননি। সরকার বিরোধী আন্দোলন একটা ত্রিভুজাকৃতি ধারন করেছিলো।

সরকার ও বিরোধী রাজনীতির মুখোমুখি অবস্থানের ফলে রাজনৈতিক অংগন ছিল অশান্ত। বিরোধী দল গুলোর ব্যাপক আন্দোলন, কর্মসূচী সরকারের কঠোর মনোভাব এবং ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল, কারন এই সময়ে রাজনীতির অংগন যত সর গরম, যত উত্তপ্ত, যত বিপর্যস্ত হয়েছে, যত সংগ্রাম, অন্দোলন উত্থান পতন ঘটেছে, আর কখনো তা হয়নি। হরতাল, ধর্মঘট, রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন অবরোধ এ সময়ের একটি রেকর্ড। বিক্ষোভ ও সমাবেশ ছিল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সর্বশেষ অনুসংগ হয়েছে জরুরী অবস্থা ঘোষনা। এক পরিসংখ্যান - এ দেখা যায় ১৯৮৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ৮৯ এর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত হরতাল হয়েছে ২ হাজার ঘন্টার বেশী। বিরোধী দলের হিসেব অনুযায়ী এসময় রাজনৈতিক আন্দোলনে নিহত হয়েছে ১৭০ জনের মত। এর অধিকাংশ খবরই অপ্রকাশিত। তবে সরকারের দেয়া হিসেব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এর বেশী নয়। এই সময়ের মধ্যে অন্দোলনে দুই নেত্রী গৃহান্তরীন ছিলেন ১২৫ দিন। দুই নেত্রীই বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছেন।[৭] তাই এই সময়ের রাজনীতি যেমন গণতন্ত্রের জন্যে উৎপীড়ন ও বঞ্চনার, তেমনি মুক্ত স্বদেশের জন্যে মোটেই স্বস্তিকর সময় ছিল না। সর্বত্রই রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে দেশে যে রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল তাকে কোন অবস্থাতেই গণতানিন্ত্রক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা যায় না। ফলে রাজনীতির সুষ্ঠু বিকাশ হয়ে পড়েছিল রুদ্ধ। স্থিতিশীলতা হয়েছিল সুদুর পরাহত। যে জনগণের জন্য রাজনীতি, সেই জনগন হয়ে পড়েছিল অসহায়।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক পর্যায়ে এসে এই পরিস্থিতির সর্বনাশা রূপ উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের মাঠ পরিস্থিতির অবস্থাগত ও গুনগত উত্তরনের ক্রমবিকাশে অর্থবহ ঐক্য গড়ে তোলে। সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে নয় বছরের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে শেষ আঘাত দেবার জন্যে ব্যাপক সংগ্রামী জনগণ এবং সংগ্রামে প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্র- শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, পেশাজীবি সমাজ ও অন্যান্যদের প্রচন্ড চাপের মুখে আন্দোলনরত রাজনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত তিনটি রাজনৈতিক জোট বেগবান হওয়া আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ সালে' তিন জোটের এক যৌথ ঘোষনা প্রদান করে। জেঃ এরশাদের সামরিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে সেটার পতন ঘটানোর ব্যাপারে তাদের দিক থেকে সবচেয়ে পরিকল্পিত, অগ্রসর ও সাহসী কর্মসূচীও পদক্ষেপ। ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনার পরই আন্দোলনে গতি লাভ করে এবং এক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ন হয়। আর তখনই বিরোধী রাজনীতি

৭) আমীর খসরু, রাজনীতি থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সিদ্ধান্তমূলক আন্দোলনে পরিনত হয়ে খন্ডিত ঐক্যকে অতিক্রম করে বিরোধী রাজনীতির ঐক্যে সম্পূর্নতা আসে তখন স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে। একটি মহিমান্বিত বিজয় অর্জন করে বাংলার মানুষ। দশকের শুরুতে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে যে রাজনীতিকে জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সামরিক সরকার বন্দী করে রেখেছিলেন নিজস্ব খেয়াল খুশীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে। যে রাজনীতি হয়ে পড়েছিল ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও কূটকৌশলের নিশ্চিদ্র দুর্গে বন্দী। সমষ্ঠিগত প্রজ্ঞার আলোকে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি। রাজনীতি হতে পারেনি সমাধান মূলক, দশকের শেষে গণ আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সেই রাজনীতি মুক্ত হয়ে জনগণের কাছে ফিরে আসে। জয় হয় রাজনীতির।

এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে মনে হয় এই দশকটি যেন বাংলাদেশের রাজনীতির নাট্যমঞ্চে ঝড়তোলা এক অভিনেতা। মঞ্চের এক প্রান্ত দিয়ে ঝড়ের বেগে তার প্রবেশ আর সমস্ত মঞ্চ তোলপাড় করে অন্য প্রান্ত দিয়ে তার প্রস্থান।[৮]

অর্থনৈতিক অবস্থা

স্বাধীনতা উত্তরকালে নব সৃষ্ঠ রাষ্ট্রে বিধ্বস্ত অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ার আগেই রাজনৈতিক বিপর্যয় দেশের অর্থনীতিকে চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। এই রাজনৈতিক সংকট দেশের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী অশুভ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সরকারগুলোর অপরিকল্পিত, অবাস্তব সামঞ্জস্যহীন ও পরনির্ভরশীল আর্থনীতিক কাঠামোকে ক্রমশ দেউলিয়া করে দিতে থাকে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে শেষ ধাক্কাটি আসে (৮২-৯০) এই সময়ে এরশাদ সরকারের নিকট থেকে। (৮২-৯০) এই দীর্ঘ সময় দেশ আবর্তিত হয়েছে সামরিক আইনে। সান্ধ্য আইনে। জরুরী অবস্থা আর বিশেষ আইনে। আবর্তিত হয়েছে সীমাহীন স্বৈরাচারের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, জাতীয় সম্পদের অবাধ লুঠপাঠ, দিক নির্দেশনাহীন অর্থনৈতিক কাঠামো, অব্যাহত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাহীনতা আর অবারিত লুঠপাঠ প্রক্রিয়ায় গোটা অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে নেমে আসে স্থবিরতা। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে জাতীয় অর্থনীতির উপর। অর্থনীতিক অব্যবস্থা ও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনের ফলে বাংলাদেশে একটি মারাত্মক আর্থনীতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আর্থিক শৃংখলার অভাব এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থে অর্থনীতিকে সাজানোর দরুন (৮২-৯০) এই সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক মন্দাই ছিল এই দশকের বৈশিষ্ট্য। সরকারী নীতির ফলে বাংলাদেশ এই সময়ে ক্রমেই সর্বাংশে বিদেশ নির্ভর জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই সময়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গণমুখী হয়নি। জাতীয় অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। এই সময় এদেশের অর্থনীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েছে জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বা জীবনের উৎকর্ষ সাধন তো দূরের কথা দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরনের ব্যাপারেও অর্থনীতির ব্যর্থতা নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সময়ের অর্থনীতিকে শুধু বিপর্যস্ত বললে এত টুকুও বলা হলো না। এই সময়ে সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লুঠেরা ধনিক গোষ্ঠী সমস্ত অর্থনীতিকে পংগু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতি (৮২-৯০) এই সময়ে যে অবস্থায় পৌছেছিল তার নিজস্ব দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। যে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র অর্থনীতি কিরূপ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হবে।

---

৮) দৈনিক সংবাদ, ৫ই মার্চ, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

এরশাদ সরকার বছরে ৭শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলেও (৮২-৯০) এই ৮ বছরে একবার ও প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে চার শতাংশ অতিক্রম করেনি। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে (৮২-৯০) এই সময় কালের মধ্যে কোন বছরই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বরং অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধির গতি সত্তরের দশক ও আশির দশকের প্রথম ভাগের তুলনায় মন্থর হয়ে পড়েছে।

এই সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল নিম্নরূপ ঃ-

অর্থ বছর	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত প্রবৃদ্ধি
১৯৮১-৮২	৫.৪	০.৯৪
১৯৮২-৮৩	৬.৪	৩.৬৯
১৯৮৩-৮৪	৬.০	৪.২০
১৯৮৪-৮৫	৬.২০	৩.৯৩
১৯৮৫-৮৬	৫.৫	৪.১
১৯৮৬-৮৭	৫.২	৪.০
১৯৮৭-৮৮	৫.২	২.৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬	২.৯

সূত্র ঃ বিভিন্ন বছরের অর্থনৈতিক জরীপ থেকে এ সারণীটি প্রণীত।

এই ৮ বছরে মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের (জি,ডি,পি) গড় প্রবৃদ্ধি নেমে আসে বার্ষিক ৩ শতাংশে। ১৯৭২-৮১ এই দশ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির এই বার্ষিক হার ছিল ৬ শতাংশ। মাথা পিছু নেট জাতীয় আয় (৭২-৭৩ সালের স্থির মূল্যে) বেড়েছে এই ৮ বছরে মাত্র ৩৫ টাকা।[৯]

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা

১৯৮২-৯০ সময় কালে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার পথে অগ্রসর হয়নি বরং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে দ্রুত গতিতে। ১৯৮০-৮১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৬৫ শতাংশ ছিলো বৈদেশিক সাহায্য। ৮২-৮৩তে এ নির্ভরশীলতা বেড়ে ৭৯.৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। তার পরের বছর গুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬-৮৭তে ৯৭.৯২ শতাংশে পৌঁছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে পরিস্থিতি উন্নতির বদলে আরও অবনতি ঘটে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে সরকারী খাতে মোট খরচের পরিমান ছিল ১০,৭০০ কোটি টাকা এবং প্রায় ৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ৪৬০০ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে প্রাপ্ত। ঐ বছর বিনিয়োগের কলেবর ছিল জাতীয় আয়ের ১১.৭ শতাংশ এবং তার ৬১ ভাগ ছিল বৈদেশিক সাহায্য। এই প্রচন্ড নির্ভরশীলতার কারনে দাতা গোষ্ঠির চিন্তা ধারা আমাদের অর্থনীতিক কর্মকান্ডকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করে।[১০]

---

৯) সংবাদ, ২৫শে মার্চ, ১৯৮৯।

১০) ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব ও বাস্তবের ব্যবধান

৮২-৯০ এই সময়ে হিসাব ও বাস্তবের ব্যবধান খুব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। অনেকের মতে ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি সৃষ্টি এই বিশৃংখলার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ, হিসাব ও বাস্তবের ব্যবধান নিম্নের ছকটি দেখলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাজেটের হিসেব ও সংশোধন (কোটি টাকার হিসেবে)

	রাজস্ব আয়		রাজস্ব ব্যয়		উন্নয়ন কার্যএম		বৈদেশিক সাহায্য	
	হিসেব	সংশোধন	হিসেব	সংশোধন	হিসেব	সংশোধন	হিসেব	সংশোধন
৮০-৮১	২২৯৬	২৩৪৩	১৪০৮	১৪৮২	২৭০০	২৩৬৯	২২৬৩	১৮১৬
৮১-৮২	২৮৫৪	২৫৫৪	১৬৬২	১৮৫০	৩০১৫	২৭১৫	২২০৬	২১৮৬
৮২-৮৩	২৭৬৮	২৭১১	২০৩৭	২১৪৬	২৭০০	৩১২৬	২৪৯০	২৮৯২
৮৩-৮৪	৩৩৪৫	৩০৩৩	২৪১৪	২৫০৩	৩৪৮৩	৩৪৩২	৩০১৫	২৪৮০
৮৪-৮৫	৩৪৬৫	৩৪৭৭	২৮০২	২৪৩০	৩৮১৬	৩৬০৮	৩৮৯৭	৩১০৭
৮৫-৮৬	৩৭৫৪	৪০৩৭	৩৩১৩	৩৪২১	৩৮২৫	৪০৯৫	৩৮৮৫	৪০১৮
৮৬-৮৭	৪৪৬৮	৪৭১১	৩৭৪০	৩৯৫৬	৪৭৬৪	৪৫১৩	৪৪৭২	৫৩৭২
৮৭-৮৮	৫৯১৫	৫১৪৬	৪৪৮১	৪৭৩১	৫০৪৬	৪৬৫১	৫০০৩	৫০৬৬
৮৮-৮৯	৫৫৬৯	৫৮২২	৫২৫০	৬১৭০	৫৩১৫	৪৫৯৫	৫০৮৮	৪৮৮৫
৮৯-৯০	৭১৮১	৬৮১০	৬৯০০	৬৮৪০	৫৮০৩	৪৩১০	৫৯৫৬	৫৪৯৪

সূত্র ঃ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক বাজেট সারাংশ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০।

খাদ্য আমদানী বৃদ্ধি পায়

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার সাথে সাথে গড়ে উঠে আমদানীর মানসিকতা। ফলে বাজার দর কমে যায়। এই সময় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য কয়েক দফা পিছিয়েছে। হ্রাসকৃত এসব লক্ষ্যমাত্রা ও এই ৯ বছরে বাস্তবের মুখ দেখেনি। ৮৫ সালের মধ্যে ২ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপাদনে লক্ষ্য ও কাট ছাঁট করে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টনে নামিয়ে আনা হয়। ৮৪-৮৫ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমান দাড়ায় ১ কোটি ৫৮ লাখ ৩২ হাজার টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯০ সালের মধ্যে ২ কোটি ৭ লাখ টন উৎপাদনের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। এ প্রত্যাশার বিপরীতে ৮২-৮৯ এই ৭ বছরে উৎপাদন বাড়ে মাত্র ১০ লাখ টন। ৮০-৮১ সালে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ছিলো ১ কোটি ৫১ লাখ টন। চলতি ৮৮-৮৯ সালে বড়জোর ১ কোটি ৬১ লাখ টনে দাঁড়াতে পারে। এ ৭ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি। ফলে মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন নাটকীয় গতিতে হ্রাস পেয়েছে। সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে, উৎসাহ মূল্য নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীন সংগ্রহ অভিযান জোর দারের ঘোষনা দিয়েছে বার বার। আপাময় কৃষকের সে প্রত্যাশার বিপরীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য আমদানী করা হয়। অভ্যন্তরীন সংগ্রহ এই ৯ বছরে ক্রমাগত হ্রাস পায়। ৮০-৮১ সালে এর পরিমান ছিলো ১০ লাখ ৩৩ হাজার টন। ৮৮-৮৯ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীন খাদ্য সংগ্রহ ৩ লাখ ৮২ হাজার টনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়।[১১]

১১) আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুণর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিখাতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস

এই সময়কালে কৃষিখাতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। ৭২-৮১ এই দশ বছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো। ৩.৫ শতাংশ। অথচ এ সময় অর্জিত হয় ১.৫ শতাংশ। নিম্নে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার দেয়া হলো।

কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হার ছিল নিম্নরূপ ঃ-

অর্থ-বছর	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত প্রবৃদ্ধি
৮০-৮১	৫.৯ শতাংশ	৮ শতাংশ
৮৩-৮৪		৫.৯ শতাংশ
৮৪-৮৫	৫ শতাংশ	০.৯ শতাংশ
৮৫-৮৬	৫.৫ শতাংশ	৩.৪ শতাংশ
৮৬-৮৭	৫.৫ শতাংশ	১.৬ শতাংশ
৮৭-৮৮	৩.৭ শতাংশ	১.০৫ শতাংশ
৮৮-৮৯	৬.২ শতাংশ	৪.৬ শতাংশ

উৎস ঃ দৈনিক সংবাদ, এরশাদ শাসনের ৭ বছর, ২৫শে মার্চ, ১৯৮৯।

শিল্প ক্ষেত্রে নেমে আসে বিপর্যয়

৮২-৯০ বছরে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিল্প ক্ষেত্রে ও নেমে এসেছিল বিপর্যয়। শিল্প বিনিয়োগ-এ মন্থরতা, ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে চাহিদা সংকট, সঠিক নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ শিল্পায়নের ঘোষিত লক্ষ্য ভেস্তে-এ গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে ৮২'র পর ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া বহু পাট ও বস্ত্রকল বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প খাতে ৭২-৮১ এই দশ বছরে যেখানে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১৩.৯ শতাংশ। ৮২-৮৯ সময় কালে এই গড় হার ৩ শতাংশে নেমে আসে। অর্থমন্ত্রী এম, সাইদুজ্জামান ৮৫-৮৬ সালের বাজেট ঘোষণা কালে স্বীকার করেছেন অর্থলগ্নির প্রতিষ্ঠান গুলোর অসন্তোষজনক আর্থিক অব্যবস্থার জন্য সরকারের পক্ষে শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।[১২]

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রেও কোন সাফল্য আসেনি

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রেও কোন সাফল্য চোখে পড়ে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৮ শতাংশ নামিয়ে আনার ঘোষিত লক্ষ্য ও অর্জন সম্ভব হয়নি। এমনকি ৮১-৮২ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেখানে ২.৪ শতাংশ ছিল। ৮৮-৮৯ সালে এই হার পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবে ২.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই নয় বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি। চলতি ৮৮-৮৯ সালে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।[১৩]

১২। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭।
১৩। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

মাথাপিছু জাতীয় আয়

এই সময় মাথাপিছু জাতীয় আয় ও হ্রাস পায়। ৮২-৮৯ এই সাত বছরের মাথাপিছু নেট জাতীয় আয় (৭২-৭৩ সালের স্থিরমূল্যে) বেড়েছে মাত্র ৩০ টাকা। গড়ে বছরে এই মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পায় মাত্র ৫ টাকা হারে। এরশাদ সরকারের প্রথম বছর ৮২-৮৩ সালে মাথা পিছু নীট জাতীয় আয় (৭২-৭৩ স্থিরমূল্যে) মাত্র ৫টাকা বেড়ে ৭৩০ টাকা দাঁড়ায়। পরের বছর বাড়ে ৮ টাকা। ৮৪-৮৫ সালে মাথাপিছু নীট জাতীয় আয় এক পয়সা ও বৃদ্ধি পায়নি। ৭৩৮ টাকায় স্থির হয়ে থাকে। এর পরের বার মাথা পিছু এই আয় বাড়ে ১৮ টাকা। ৮৬-৮৭ সালে ২৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। পরেরবার এই আয় বাড়েনি বরং উল্টো ৭টাকা কমে ৭৭০ টাকা দাঁড়ায়।[১৪]

মোট বিনিয়োগের পরিমান ছিল স্থবির

দেশে সরকারী-বেসরকারী খাত মিলিয়ে মোট বিনিয়োগ পরিমান এই আমলে ছিল স্থবির। ৮৭-৮৮ সালে মোট বিনিয়োগ প্রকৃত অংকে ৪ শতাংশ হ্রাস পায়। মোট বিনিয়োগের পরিমান এক বছরে আরেক দফা প্রায় ২০ শতাংশ কমে যায়। ৮০-৮১ সালে জি,ডি,পির ১৬ শতাংশ ছিল মোট বিনিয়োগ। জি,ডি,পি, বিনিয়োগে এই অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলতি ৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৯ শতাংশে দাঁড়ায়।[১৫]

সরকারী সম্পদের অপচয়

৮২-৯০ সময়কালে সরকারী সম্পদের অপচয় রোধ ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার হয়েছে ব্যাপক। ৮২-৮৮ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ অডিট, আপত্তি করে ছিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এসব অডিট আপত্তিতে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদের আত্মসাত ও অনিয়মের ঘটনা ধরা পড়েছিল পাবলিক একাউন্ট কমিটির হাতে।[১৬]

বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি

৮২-৯০ সময়কালে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু আয় তেমন বৃদ্ধি পায়নি ফলে সঞ্চয় প্রায় ছিলই না বলা যায়। এই সময়কালে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও মূলধন পরিশোধ বাবদ বার্ষিক দেনা বেড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে। নিম্নের ছকটি দেখলে আমরা বিভিন্ন খাতে ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা অনুধাবন করতে পারবো।[১৭]

---

১৪) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১২।
১৫) ঐ পৃঃ ৭১৪।
১৬) রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।
১৭) ঐ পৃঃ ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি (কোটি টাকার হিসেবে)।

বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	বৈদেশিক সাহায্য	উন্নয়ন কার্যক্রম	প্রতিরক্ষা	নিরাপত্তা	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	বৈদেশিক ঋণ	বেতন ও ভাতা
৭২-৭৩	২২৩	২৯১	৪৩৫	৩৯৮	২০	৬৫	৪৬	১২	৮০	১১৯
৭৫-৭৬	৮৮৩	৬৮৪	১০৪২	৯৫০	১৬০	২০৫	১৩৮	৮২		
৮০-৮১	২৩৪৩	১৪১৮	১৮১৬	২৩৬৯	৩২৫	৪৩৬	৩০৩	২০৭	১০৬	২৭৫
৮৪-৮৫	৩৪৭৭	২৯৩০	৩৩০৭	৩৫০৮	৫৬৬	৭৩৪	৬২১	৩৭০	৫৮৬	
৮৫-৮৬	৪০৩৭	৩৪২০	৪০১৮	৪০৯৫	৬৭৮	৮৯০	৭৮২	৩১৩	৭৭৬	১৩৩৬
৮৬-৮৭	৪৭১১	৩৯৫৬	৪৩৭২	৪৫১৩	৮৯২	১০৬৯	৯৬১	৪৯৭	১০৪৬	১৪৮৫
৮৭-৮৮	৫১৪৬	৪৭৩০	৫০৮৬	৪৬৫১	৯৩৪	১২১২	১০৭২	৫৬২	৯২৮	১৭১১
৮৮-৮৯	৫৯২২	৬১৭০	৪৮৮৫	৪৫৯৫	১১৩৯	১৪৩৯	১২০৬	৬৩৮	১১৫৪	১৯১০
৮৯-৯০	৭১৮০	৬৯০০	৫৯৫৬	৫৮০৩	১১৩২	১৪৬০	১৩১৫	৭৯৩	১২৮৩	১৯৬০

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক বাজেট সারাংশ ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮৯-৯০।

দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তখন বাংলাদেশের অর্থনীতির রুদ্ধ গতি আমাদেরকে যথার্থই বিস্ময়ে বিমূঢ় করে।

সামরিকীকরণ

(১৯৮২-৯০) সময়কালে রাষ্ট্র-সরকার, প্রশাসন এবং রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড সবকিছু অস্তিত্বশীল ছিল একটা অসাংবিধানিক কনষ্টিটুয়েন্সীর ওপর। আর এটি হচ্ছে সামরিক বাহিনী। বাস্তব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' পর্যন্ত সর্বত্রই সামরিক বাহিনী ছিল প্রথম সর্ব প্রাধান্যশীল ও চূড়ান্ত। (৮২-৯০) পর্যায়ে সামরিক বাহিনী হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রকাঠামো ও সরকারের মৌল নিয়ন্ত্রক। এসময়ের মধ্যেই সর্বগ্রাসী সামরিকীকরণ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ক্ষমতা দখল করার পর থেকে এই সামরিকীকরণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনের সকল বিভাগ ও শাখায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রাক্তন ও বর্তমান উভয়ই ব্যাপক মাত্রায় পদ দখল করতে থাকে। বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত লক্ষীভূত হয়। 'কী পোষ্ঠ' সমূহের বিশাল অংশই সামরিক সদস্যদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর থাবার স্বীকার হয়।

নিজের আসন সংহত করার পরই এরশাদ সরকার মনোযোগ দেন সামরিকায়নে। প্রশাসন পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই ছিলেন সামরিক বাহিনীর (দু'জন লেঃ কর্নেল ও একজন মেজর)। 'এনাম কমিটি' নামে পরিচিত এ কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/কর্পোরেশন ইত্যাদির ৩,২৫৫টি পদ হ্রাস করে ২,৮৭৩টি পদের স্বীকৃতি দেয়। এনাম কমিটির কাজ সম্পর্কে সরকারী গেজেটে মন্তব্য করা হয়, জাতি এতে উপকৃত হবে।[১৮]

এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে দ্রুতলয়ে অবসর প্রাপ্তদের নিয়ে আসেন সামরিক প্রশাসনে। এরশাদ সরকার এভাবে প্রশাসনে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন এক শ্রেণী যার পরিচিতি হয়ে উঠেছিলো 'অবঃ' নামে। এদের নিয়োগের ব্যাপারে যখন যা নিয়ম তৈরী করা প্রয়োজন তা করা হতো। এরা সেনাবাহিনীর সুযোগ সুবিধা পেতেন এবং একই সঙ্গে ভোগ করতেন বেসামরিক প্রশাসনের সুযোগ সুবিধা। এক হিসেবে জানা যায়, প্রায় ৯০টি বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রধান পদে এক তৃতীয়াংশ ছিলেন অবসর প্রাপ্তরা।[১৯]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিকীকরণ ঃ প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নমুনা চিত্র।

রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণালয়ের নমুনা (আপন বিভাগ)

সামরিকীকরণের ব্যাপক প্রক্রিয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রথমেই রাষ্টপতির সচিবালয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সহকারী সচিব, পি এস ও টু সুপ্রীম কমান্ডার, রাষ্ট্রপতির চারজন এডিসি, সর্বাধিনায়কের পি এস ও এবং প্রধান সমন্বয়করী এ সময় এরা সবাই ছিলেন সামরিক অফিসার। এছাড়া ট্রান্সপোর্ট অফিসার, সিনিয়র কম্পট্রোলার, কম্পট্রোলার, সহঃ কম্পট্রোলার, ট্রান্সপোর্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, মহিলা মেডিকেল অফিসার (বঙ্গ ভবন চিকিৎসালয়) এবং সি ও পিজি আর - সেনা নিবাস (রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্ট) এরা সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন। তেজগাঁও পুরাতন সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ), প্রাকৃতিক জন সম্পদ ও সমাজ উন্নয়ন অনুবিভাগে মহাপরিচালক এবং জাতীয় নিরাপত্তার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রন সেলে চেয়ারম্যান সহ অতিরিক্ত পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক পদে সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন।[২০]

---

১৮) Government of Bangladesh, Tables of Organization and Equipment : Ministries, Constitutional Bodies, Commissions etc. Dhaka, 1982.

১৯) সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তালিকা, ১৯৯০।

২০) হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'জন যুগ্ম সচিব ছিলেন ব্রিগেড়িয়ার, দু'জন, উপ-সচিব ছিলেন মেজর, প্রকৌশল উপদেষ্টা ছিলেন একজন লেঃ কর্নেল। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালক ছিলেন একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন।[২১]

১৯৮৭ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর সকল কর্মকান্ডের ওপর থেকে বে-সামরিক নিয়ন্ত্রন সম্পূর্ন বিলোপ করার গূঢ় পরিকল্পনানুযায়ী "রুলস অব বিজনেস ১৯৭৫" এর প্রথম ও তৃতীয় তফসিল সহ অন্যান্য বিধি স্বেচ্ছাচারীভাবে সংশোধন করা হয়।[২২]

এভাবে সামরিক রাষ্ট্রপতি জেঃ এরশাদ সম্পূর্ণভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রনাধীন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্মকান্ডকে কেন্দ্রীভূত করে ছিলেন। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে ইতি পূর্বেই তিনি ছয়টি বিভাগ ও সচিবালয়কে অনুর্ভূক্ত করে ছিলেন। সুপ্রিম কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স ডিভিশন গঠন করার পর এই সংখ্যা ৭ - এ দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এর পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয় ও নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে এভাবে এই সময়ে একাধারে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বেসামরিক ক্ষেত্রের সামরিকীকরনের অদৃষ্টপূর্ব নজীর তৈরী করেন বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপ সচিব (ডি,এস,) পদে নিযুক্ত ছিলেন একজন মেজর। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বিভাগে ২৩ জন লেফটেন্যান্ট থেকে মেজর পদ মর্যাদার অফিসার কে নিয়োগ করা হয়। ডি আই জি পদে নিযুক্ত হন চৌদ্দজন। এদের মধ্যে নয়জন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী ছয়জন আই এ। এস পি পদে নিয়োগ করা হয় ৯ জনকে। এদের মধ্যে দুইজন আই, এ,পাস, বাকী ৭ জন গ্রাজুয়েট। উল্লেখ্য যে, এদের সমমর্যাদার অফিসাররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে বিশেষ প্রশিক্ষন লাভ শেষে নিযুক্তি পেতেন পুলিশ প্রশাসনে। এই সব সামরিক কর্মকর্তাদের দু'বছর সিনিয়রিটি দেওয়া হয়। ফলে, কর্মরত বেসামরিক অফিসাররা জুনিয়র হয়ে যান।[২৩]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অধিদপ্তর, যেমন - আনসার, ভিডিপি, জেল, ফায়ার প্রভৃতিতে ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। আনসার ও ভিডিপি অধিদফতরের মহা-পরিচালক ছিলেন একজন মেজর জেনারেল। বাকী আট জন কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন, মেজর, লেঃ কর্নেল, কর্নেল ও ব্রিগেড়িয়ার। দমকল বাহিনীর মহাপরিচালক ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার, বাকী দু'জন কর্মকর্তা মেজর। কারা পরিদফতরের প্রধান ছিলেন একজন কর্নেল।[২৪]

১৯৯০ এর ৩রা ডিসেম্বর পুলিশ বিভাগের সদস্যরা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক গোপন প্রচার পত্র প্রকাশ করে। প্রচারিত ঐ প্রচারপত্রে "স্বৈরাচার নিপাত যাক / গণতন্ত্র মুক্তি পাক" এই

---

২১) হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

২২) একতা, ১৫-৮-১৯৮৯।

২৩) হাসান উজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩-২৯।

২৪) ঐ পৃঃ ৩৫-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

শ্লোগান রাখা হয়। এই বিভাগের সামরিকীকরণ প্রসঙ্গে প্রচার প্রত্রটিতে বলা হয়, গত ৮ বছরে বহু দুর্নীতিবাজ সামরিক কর্মকর্তাকে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানের ২৩ জন এস,পি, পূর্বে সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। এছাড়া ও পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দয়া দাক্ষিন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি তার স্বাধীন ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে"।[২৫]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে মিলিটারী এ্যাটাচীর পদে তো স্বাভাবিক ভাবেই সামরিক অফিসারগণ রয়েছেন। এছাড়া এ সময় দূতাবাস গুলোর অন্যান্য বেসামরিক পদগুলো ও সামরিক অফিসাররা দখল করেছে বহুলাংশে।

এসময়ে ত্রিশজন অবঃ কে ঢোকানো হয়েছিলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং এদের নিয়োগ করা হয়েছিলো ইউরোপ ও সমৃদ্ধ দেশ সমূহে। এ প্রক্রিয়া নিয়ে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিলো - "এরশাদের দুর্বিসহ দুঃশাসনে ৯ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরশাদ কখন ও সরাসরি নিজে, কখনও তার অনুগত তিনজন - এআর এস, দোহা, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সাহায্যে বার বার এ মন্ত্রণালয়কে আক্রমন করেছে,। ক্ষত বিক্ষত করেছে এর কাঠামো, কর্মদক্ষতা এবং ভাবমূর্তি।[২৬]

এসময়ে ১১ জন রাষ্ট্রদূত ছিলেন অবঃ জেনারেল ও ২ জন অবঃ ব্রিগেডিয়ার। প্রটোকল প্রধান ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। উচ্চ পদে ছিলেন ১৪ জন অবঃ মেজর। বিবিসি এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করে ছিলো - "পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অন্য সার্ভিসের লোক এনে নিয়োগের ফলে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ফরেন সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ট পরিনত হতে চলেছে"।[২৭]

১৯৮২-৯০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র দফতর কিভাবে চলতো সে সম্পর্কে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় "পররাষ্ট্র দফতরে নিয়োগ বদলী ছিল এরশাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। এরশাদ যা বলতেন তাই হতো। এক সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মিনি ক্যান্টনমেন্ট বলা হতো। এতে পেশাদার কূটনীতিকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিলো। এরশাদ ইচ্ছে করেই এই গোলমাল বাধিয়ে রাখতেন। নজরদারি করাতেন এককে অপরের বিরুদ্ধে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হতো"।[২৮]

প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র - এ তিনটি মন্ত্রণালয়ে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যায়ে সামরিক নিয়ন্ত্রনাধীন শাসনামলে সংঘটিত সামরিকীকরনের ফলে-

ক) রাষ্ট্র ও সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে।

খ) আইনের শাসন ও নিয়মনীতি বিনষ্ঠ হয়েছে।

---

২৫) গোপন সাকুলার নং - ১। এই প্রচার প্রত্রটি ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে ঢাকা মহানগরীতে জনগণের কাছে বিলি করা হয়।

২৬) সংবাদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক অজানা কাহিনী, ৩-১-১৯৯১।

২৭) একতা, ৮-৫ ১৯৮৭।

২৮) পূর্বাভাস (সাপ্তাহিক প্রত্রিকা), ঢাকাঃ বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

গ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন, পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরনের পদ্ধতি সমূহ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।
ঘ) সরকার ও প্রশাসনে দায়িত্বশীলতা ও জবাব দিহির ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে।
ঙ) সামরিক বেসামরিক রেষারেষি ও দ্বন্দ্ব চরমাকার ধারন করে প্রশাসনকে মন্ত্রণালয়কে অচল করে তুলেছে।[২৯]

একজন অতিরিক্ত সচিব - 'প্রাক্তন সি,এস,পি, সৎ ও দক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে চাকরীরত ছিলেন - অবসর নেয়ার কয়েক বছর বাকি থাকা সত্ত্বে ও কেন স্বেচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বর্তমান লেখককে বলেছিলেন "এরশাদের ওয়ানম্যান শো আর সহ্য হচ্ছেনা এবং সামরিক কর্তারা চাকরীর পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে, তাই চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। ভলানটারী রিটায়ারমেন্ট নিচ্ছি"। অন্য একটি মন্ত্রণালয়ের অপর এক আমলা বলেছিলেন ঃ "এই একটা লোক সবকিছু শেষ করে দিল। ফাইল কভার কেনা থেকে শুরু করে চিকিৎসার জন্যে পিয়নের ভারত গমন সব কিছুতেই তার হস্তক্ষেপ।[৩০]

বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরনের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন সোচ্চার তিনি হলেন তৎকালীন বিসিএস (প্রশাসন) মহা সচিব ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর এরশাদ সরকার দীর্ঘদিন তাঁকে ওএসডি করে রাখে।[৩১] প্রশাসনের সোচ্চার প্রতিবাদ শুরু হয় ১৯৮৮ সালে যখন এরশাদ ঘোষনা করেন অবঃ দের জন্য বেসামরিক চাকরীর ১০% সংরক্ষন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিসিএস (প্রশাসন) তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানায়। বি সি এস সেক্রেটারিয়েট) প্রশাসন তাদের বক্তব্য প্রকাশ করে বলে- সরকারী এই সিদ্ধান্তে বিসি এস (প্রশাসন) সহ "বেশ কিছু সার্ভিস ক্যাডার এসোসিয়েশন" এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে। "বিভিন্ন সিভিল সার্ভিস ক্যাডারে বহিরাগতদের অনিয়মতান্ত্রিক ও বিধি বহির্ভূত নিয়োগ জাতীয় স্বার্থেই পরিত্যাজ্য বলে আমরা মনে করি। কারন অতীতে লক্ষ্য করা গেছে যে, এই ধরনের নিয়োগ/নিযুক্তি সিভিল সার্ভিসের দক্ষতাকে বিনষ্ট করেছে। এর কাঠামোগত অখন্ডতার উপর আঘাত হেনেছে এবং নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে"।[৩২]

তবে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ডঃ আলমগীরের একটি বক্তব্য নিয়ে সরকারী মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। নাগরিক কমিটি আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন, সরকারে অবস্থিত সিভিল সার্ভেন্টরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, ব্যক্তি বিশেষের নয়। ক্যাডার সার্ভিসের প্রত্যেকটি সদস্যকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ও পদোন্নতির সুযোগ দিতে হবে। বিসিএস - এর ৩০টি ক্যাডারের বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ করা যাবেনা এবং ৫৭ বছরের বেশী চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো চলবে না"।[৩৩]

'অ্যাকশন কমিটি ফর সিভিল রুল' দাবি জানায়- " বাংলাদেশ পুলিশসহ বেসামরিক প্রশাসনের সকল পদ হতে সামরিক উর্দিওয়ালাদের অপসারণ করতে হবে"।[৩৪]

---

২৯) হাসান উজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র- বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, পৃঃ ৬৯।
৩০) হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।
৩১) মুনতাসীর মামুন জয়ন্তকুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৪৩।
৩২) একতা, ৫-১০-১৯৮৮।
৩৩) মোহাম্মদ খোশরু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময়কাল), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১১৯।
৩৪) এ্যাকশন কমিটি ফর সিভিল রুল, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হউন, ২৭-১০-১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আমলা

আমলা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু। আমলারাই প্রকৃত পক্ষে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলনীতি নির্ধারক। ক্ষমতার মূল উৎস।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা গৌরবে উজ্জ্বল নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এদেশের আমলাতন্ত্রের কাঠামোয় আমলার ক্ষমতার অপব্যবহার, আচার-আচরন, শ্রেণী অবস্থান, পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি না করার প্রবনতা তাদেরকে করেছে জনবিচ্ছিন্ন ও নিন্দিত। এজন্য এককভাবে আমলাদের দায়ী করা যায়না। রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে নিয়ন্ত্রনহীন ও জবাবদিহিবিহীন এই আমলাতন্ত্র স্বৈরাচারের সহযোগী হয়ে ওঠে কিংবা নিজেই স্বৈরাচারের রূপ নেয় তা আমরা দেখতে পাই (৮২-৯০) এই সময়ের বাংলাদেশে।

আসলে আমলাদের রাজনীতিতে টেনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল সামরিক ও স্বৈরশাসকরা। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে গ্রহন যোগ্য করার জন্য যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি শুরু করে তা সফল করার জন্যই আমলাদের প্রয়োজন হয়েছিল। বিশেষ করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ার সাথে যে সব আমলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ও আমলাদের রাজনীতিতে পূর্ণবাসিত করা হয়। এইভাবে সামরিক ও স্বৈরশাসক আমলাদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে তাবই ধারাবাহিকতা চলে পুরো দশক জুড়ে। এমন অনেক আমলা আছেন যারা এই সময়ে অবৈধক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেযে নিজেদেরকে শুধু শক্তিশালী মনে করেননি অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মোটকথা এই সময়ে যে সব আমলা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে ভূমিকা পালন করেন ঐসব আমলার কারনেই জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র (৮২-৯০) এই সময়ে স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী হয়ে কিরূপ পরিগ্রহ করে তা তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হলো।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেঃ মোঃ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। এরপর রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য আমলাদের ক্ষমতার অংশীদার করে এবং সকল অপকর্ম ও লুণ্ঠনের সহযোগী করে তোলে। এরশাদ সরকার তাঁর ৯ বছরের শাসনকালে আমলাতন্ত্রকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করেছে। তিনি বেসামরিক উচ্চপদস্থ আমলা শ্রেণীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন।এদের নিয়ে বৈঠক ও করেছেন বিভিন্ন সময়। স্বাভাবিক নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে মন্ত্রীদের চেয়ে ও সচিব যারা সর্বোচ্চ আমলা তাদের অলিখিত ক্ষমতা দিয়ে ছিলেন। এই সময়ে জি-১০ বলে একটি শব্দ সর্বত্র শোনা যেত। এই জি-১০ হচ্ছে ১০ জনের একটি গ্রুপ। এরা সরাসরি জেঃ এরশাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[৩৫] ফলে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অবস্থান এই সময়ে নেমে যায় অনেক নীচে। এদের অবস্থান আর উপদেষ্টা এবং প্রভু শাসকের ভূমিকায় রইল না।

---

৩৫) হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, পৃঃ ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হলো দালাল শ্রেণীর পর্যায়ে। এমনটা তারা হয়েছে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করে। ফলেপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্রের যে সামান্যতম বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহনযোগ্যতা ছিল তা আর অবশিষ্ট নেই। আমলাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি পরিণত হয়েছিল স্বেচ্ছাচার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সেবাদাসে। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল প্রশাসন ব্যবস্থা। যা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা হিসেবে পরিগনিত।

বিশিষ্ট সাংবাদিক "নাজিম উদ্দীন মোস্তান" এই সময়ের আমলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পয়েল সিসটেমের সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করে যে, 'বাংলাদেশে এরশাদ সরকার তার শাসনামলে গুপ্ত সংস্থা, সচিবালয়ে কেবিনেট, সরকারী সংস্থা প্রচার মাধ্যমে, এমনকি ডাক ঘরে পর্যন্ত তার শিখন্ডী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাকে বলা হয় স্পয়েলসিসটেম।[৩৬] এরশাদ সরকার সরকারী ও আধা সরকারী আমলাতন্ত্রকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছিলেন যাতে দেশের স্থায়ী সিভিল সার্ভিস এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রশাসক কুলের অনেকে পরিনত হয়েছিল প্রভুর সেবা দাসে। প্রধান শাসকের সংগে সরাসরি সংযোগের ফলে সাধারন অনেক আমলা হয়ে উঠেছিল সচিবের চাইতে ও শক্তিশালী। কোন কোন সচিব প্রধানমন্ত্রী, এমন কি উপরাষ্ট্রপতির চাইতে ও বেশী ক্ষমতা ধরতেন।[৩৭] ফলে দেখা যায় এই আমলাদের নিয়েই স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধীদের দমন, পীড়ন, হত্যা, ভোট ডাকাতির নির্বাচনী প্রহসন নাটক মক্কায়ন, মিডিয়া, ক্যু, সকল আয় উৎস হতে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট ও তা বিদেশে পাচার শত শত কোটি টাকা ব্যয় প্রচার প্রোপাগান্ডা, ভাড়া করা লোক দিয়ে জনসভার আয়োজন, বছরের পরে বছর শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রেখে যুব সমাজকে চরম অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়া, ইত্যাকার সকল অপকর্ম সাধন করে। ফলে সমাজে মারাত্মক সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসে। অন্যদিকে এরশাদ তাঁর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য আমলাতন্ত্রেই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন নামে "উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর স্বৈরাচারী আগ্রাসনকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এভাবেই প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্তমান আমলারাই লুন্ঠন, দুর্নীতি, মিথ্যাচারও প্রবঞ্চনার এরশাদীয় এ মডেলটি নির্মান ও প্রচলন করতে সাহায্য সহযোগীতা করেছে।

আমলাতন্ত্র কিভাবে স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী শক্তিরূপে কাজ করে, কিভাবে জনগনের অর্থ লুন্ঠনে অংশ নেয়, তৃতীয় বিশ্বে তার বড় দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের ৮২-৯০ এই শাসনকাল। এই সময়ে কি দ্রুত বেগে আমলাতন্ত্র তার সর্বাগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা আমরা দেখতে পাই ১৯৮৭ সালের "সাপ্তাহিক বিচিত্রার" এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে "মিডলম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার" শীর্ষক এ প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ ছিল ঃ 'আমলাতন্ত্রের বিস্তার হিসেবে বিকাশ ঘটছে মিডলম্যানদের আর তাদের মাধ্যমে দশ কোটি লোকের সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। আমলারাই এদেশের ক্ষমতার মূল উৎস, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি নির্ধারক। তারা প্রণয়ন করেন আমদানী - রফতানী, শিল্প ও করনীতি এবং নির্ধারন করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার। ফলে তাদের হাতেই থেকে যায় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বন্টনের ক্ষমতা।

---

৩৬) নাজীমউদ্দিন মোস্তান, "প্রভুর সঙ্গে বিদায় ঃ বাংলাদেশের স্পয়েল সিষ্টেমের প্রবর্তক এরশাদ", ঢাকা, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ডিসেম্বর ২০, ১৯৯০, পৃঃ ২১।

৩৭। মাহমুদ শফিক, মিডলম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, আগষ্ট ২১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগনের নামে প্রতি বছর সাহায্য আসছে শত শত মিলিয়ন ডলার। কিন্তু বাস্তবে এর সামান্য অংশই ব্যয় হচ্ছে তাদের কল্যাণে। বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছে সুদ, কমিশন, ঘুষ প্রদানে, কখনো পুরোটাই যাচ্ছে অনুৎপাদন খাতে, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নির্মানে। অথচ ঠিকই এর সুদ, মুনাফা যাচ্ছে এক শ্রেণীর আমলা ও ব্যবসায়ীর হাতে। সরকার বদল হলে ও থেকে যাচ্ছে আমলা ও তাদের 'কৃপাপুষ্ঠ' মিডেলম্যান'রা।

এমনি ভাবেই এরশাদ ও তাঁর সহযোগী সামরিক - বেসামরিক আমলাদের বদৌলতে বাংলাদেশে দিনে দিনে কোটি পতিদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ও দ্রুত বেগে বাড়তে থাকে। সম্প্রতি চার জন বিশিষ্ট গবেষক, যথাক্রমে জনাব কামাল সিদ্দিকী, সাইয়েদা রওশন কাদির, সিতারা আলমগীর ও সাঈদুল হকে "A study in third world urban Sociology" - এর আন্তভায় ঢাকা শহরের ৬৮ জন ধনী ব্যক্তির উপর "The Richest people of Dhaka City" শীর্ষক একটি গবেষনা সম্পন্ন করেছেন যা পরবর্তী কালে ইউপিএল, ঢাকা থেকে Social Formation in Dhaka city নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশাল ব্যপ্তির এই গবেষনা কর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সত্তর লক্ষ মানুষের এই রাজধানী ঢাকায় বাস করেন ৬৮ জন ধনাঢ্য ব্যক্তি। বাংলাদেশে এরাই সব চেয়ে ধনী লোক। এরাই কোটিপতি। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে এই ধনী লোকদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের কেউ, ওদের আত্মীয় স্বজন, কেউ বন্ধু-বান্ধব। আর্থিক সুবিধা নিয়ে এই ধনীরা আমলাদের সঙ্গে খাতির জমান। ধনীদের চারজন ছাড়া বাকী ৬৪ জনই বলেছেন আমলাদের সঙ্গে তাদের সংযোগ রয়েছে। তবে তারা বলেন, 'শক্তিধর' আমলাদের চেয়ে সাধারণ আমলাদের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ বেশী। এই ধনীদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজনের দৈনিক পত্রিকা রয়েছে । বেশ কয়েকজনের আছে সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই ৬৮ জন ধনী ব্যক্তির প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত। ১৯৮২ সালের মার্শাল ল তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছে এই ধনীদের খেলাপী ঋণের পরিমান ২০০ কোটি টাকা। এই ঋণ এমন সব কোম্পানীর নামে নেয়া হয়েছে যে গুলির কোন অস্তিত্ব নেই। এই টাকা বিদেশী ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে, অথবা বিদেশে রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ে লাগানো হয়েছে।[৩৮]

এই সময় কালে এমন একজন সি, এস, পি আমলাকে ও খুঁজে পাওয়া যাবেনা যিনি এরশাদের অন্যায় ও জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেছেন। কিংবা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। বরং আমলাতন্ত্রের যে চিরন্তন প্রবাদতুল্য শপথ "আমি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা" তাকে পায়ে দলে ক্ষমতার ও ব্যক্তি এরশাদের আরো কাছাকাছি যাবার জন্য সচিব থেকে আজ্ঞাবহ মন্ত্রী হয়েছেন। এদের সামনে ছিল পদোন্নতি আর দ্রুত ভাগ্য পরিবর্তনের মুলো। বোধ হয় এই উপমহাদেশে বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসে কেবল মাত্র বাংলাদেশের সামরিক বেসামরিক আমলারাই এই সময়ে সর্বাধিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন। বলা যায়, খুব নিরাপত্তা ও আত্ম প্রসাদের সঙ্গে ক্ষমতার বলয়ে অত্যন্ত দর্পভ ও আত্মম্ভরিতার মধ্য দিয়ে শাসন দন্ড পরিচালনের চরম পরাকাষ্ট প্রদর্শনে সফল হয়েছেন আমলারা।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভয়াবহতা (৮২-৯০) এই সময়ে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। স্বৈরাচার ক্ষমতার টিকে

---

৩৮) মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, ধনিক গোষ্ঠীর লুট পাটের কাহিনী, সূচনা, ঢাকা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

থাকার জন্য আমলাতন্ত্রকে, তার হাতের পুতুল বানিয়েছে। আমলাতন্ত্রের সকল ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করেছে। আবার কখনো কখনো আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের উর্ধ্বে আমলা তার ব্যক্তিগত ও উচ্চাভিলাষের কারনে, স্বৈরাচারের সংগে অযাচিত সম্পর্ক স্থাপন করে স্বৈরাচারের সহযোগী হয়ে উঠেছে। কিংবা স্বৈরাচার তার নিজ প্রয়োজনেই, আমলা ও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে আমলাতন্ত্রের যে একটি নৈব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ সত্তা আছে, সমাজের প্রতি তার যে একটি সামাজিক অঙ্গীকার, ও দায় রয়েছে তা আর বজায় থাকেনি। আমলাতন্ত্রের মধ্যে চারিত্রিক ও গুণগত স্খলন নেমে আসে এবং গণতন্ত্র বিকাশের সকল পথরুদ্ধ হয়ে যায়। বি,সি,এস (প্রশাসন) সমিতি, তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "গত সাড়ে আট বছর ধরে একশ্রেণীর আমলার সরকারের সাথে বিশেষ সহযোগিতার কারনেই জনগন গোটা আমলাতন্ত্রকে সরকার সমর্থক হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখছে।[৩৯]

সামরিক বাহিনী

সামরিক বাহিনী যে কোন দেশের গর্ব ও গৌরবের বস্তু। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সহিত তাহারা জড়িত। দেশের ক্ষমতা ও দলীয় রাজনীতির সহিত সেনাবাহিনীকে জড়িত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ইহাতে সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তিই শুধু ক্ষুন্ন হয় না। দেশ রক্ষার মতো পবিত্র দায়িত্ব বোধের ও অবমাননা করা হয়। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস বলে বহু দলীয় সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রবেশ এবং আগমন পরিস্থিতির উন্নতির চেয়ে অবনতি ঘটায়। উপরন্ত বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনীতি একান্তই বিতর্কমূলক অতএব রাজনীতিতে/প্রশাসনে অংশগ্রহন করলে সামরিকবাহিনী একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়ে যায় যা তার পক্ষপাত শূন্য ভাবমূর্তি, পেশা ও কাঠামোগত শৃংখলা এবং ঐক্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রবেশ করলে রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করে এবং অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উপরন্ত রাজনৈতিক বিতর্কে অবতীর্ন হলে সামরিকবাহিনী সে তার জাতীয় ঐক্য প্রতীকের চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং রাজনীতির খেলার নিয়মানুযায়ী সে আর সমালোচনার উর্ধ্বে থাকার দাবিদার থাকে না। এটি সামরিক বাহিনীর জন্য শুভ ও সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই সময়ে ঠিক এমনটি ঘটেছে। এই পর্যায়ে রাজনীতির সঙ্গে সামরিকবাহিনী যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ফেলে দেয়। ৮২-৯০ এই দশকের পুরো সময়টাইে সামরিক বাহিনী ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের জড়িত রাখে। এতে তাব মূর্তির মাপকাঠিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সামরিক বাহিনী। অবশ্য শেষ পর্যায়ে আন্দোলনে জনগণের আশা আকাংখার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শান্তি শৃংখলা বজায় রেখে আমাদের সামরিক বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮২ সালের সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করার পর প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্য সর্ব ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী জড়িয়ে পড়েছে। আর এই বিষয়টি গুনগতভাবে নতুনমাত্রা ও চরিত্র অর্জন করেছে। সামরিক সরকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের বদলে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা একটি সামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উদাহরন হিসাবে বলা যায় কোন জটিল বিষয়ে মন্ত্রী সভা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এই সময়কালে। তা ৮৬-র জাতীয় সংসদ বাতিলই হোক, আর বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন মোকাবেলা করাই হোক। যেমন - ৮৪ সনের ১৫ইং অক্টোবর, "তিন জোটের" সমাবেশ ছিল ঢাকায়। এসব মহাসমাবেশে লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়ে ছিল।

---

৩৯) মোহাম্মদ খোশরু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছিল বেশ ঘোলাটে। জেনারেল এরশাদ পরের দিনই বৈঠকে বসলেন সামরিক উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে। এই বৈঠকে দেশের সর্ব শেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৪০]

এই সময়ে সামরিকবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনে ঢুকে পড়েছিল বেশ ভালভাবেই। ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল পুঁজির বিকাশে, প্রশাসনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ৮২-র সামরিক শাসন জারির পর "প্রশাসনিক পুর্নগঠন কমিটি" গঠন করা হয়েছিল, একজন 'ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে। এই কমিটি প্রশাসনে লোকবল কমানোর প্রস্তাব দিয়েছিল, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত ও হয়েছিল।[৪১] শুধুমাত্র প্রশাসনের অংশীদারিত্ব নয়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর অংশ গ্রহনের মাধ্যমে বেসামরিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং সেই সূত্রে রাজনীতিতে অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। মোট ১৩টি বেসামরিক নীতি নির্ধারনী প্রতিষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্বের বিষয় বিবেচনাধীন ছিল সরকারের। এই ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় সংসদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এন,ই,সি) রয়েছে। এর পেছনে 'সরকারী বিরোধী দল' জাসদ (রব) যে যুক্তি দিয়েছিল তা হচ্ছে 'সামরিক বাহিনী একটি বড় সামাজিক শক্তি। 'পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, এই সব প্রতিষ্ঠানে সামরিকবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে প্রথমে মনোনয়নের মাধ্যমে পরবর্তীকালে সামরিকবাহিনীর মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে কে কোন প্রতিষ্ঠানে যাবেন।[৪২]

৮২-৯০ এই দীর্ঘ সময়ে একজন জনসমর্থনহীন এবং জনবিচ্ছিন্ন সরকার ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। সামাজিক গ্রহনযোগ্যতার দিক থেকে যে সরকার অত্যন্ত দূর্বল ছিল এবং এ ধরনের দূর্বলতা নিয়ে কোন সরকারই বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। কিন্তু এরশাদ সরকার টিকে ছিলেন। কারন তাঁর ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল ক্যান্টনমেন্টের সামরিকবাহিনীর শক্তির উপর। জেনারেল এরশাদ ভালো করেই জানতেন বাংলাদেশে ক্ষমতার ভাঙ্গা গড়ায় সেনাবাহিনীই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সেনাবাহিনী যতদিন পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে ততদিন তিনি নিরাপদেই দেশ চালাতে পারবেন।[৪৩] এই ভাবে বাংলাদেশের একমাত্র জনসমর্থনহীন এবং জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রপতি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার গৌরব অর্জন করে ছিলেন সামরিক বাহিনীর সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। ঠিক তেমনি সামরিক বাহিনী ও নিজেদের হীন স্বার্থে অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করেছিলেন।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী, লন্ডনের "হিলটন হোষ্টেলের" "প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে" জেনারেল এরশাদ -এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন - তাঁর আগে বাংলাদেশের দু'জন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি কি তার নিজের জন্য এই ধরনের কোন পরিনতির আশংকা করছেন না ? তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন না, তিনি এই ধরনের কোন পরিনতির আশংকা করেন না, কারন জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, দেখুন আমি নিজের একক ইচ্ছায় ক্ষমতায় আসিনি, আবার একক ইচ্ছায় ক্ষমতায় থাকতেও চাইনা। আমি তাই রোজ একবার সিনিয়র আর্মি অফিসারদের ডাকি। জিজ্ঞেস করি তাদের কারো মনে প্রেসিডেন্ট পদে বসার ইচ্ছা জেগেছে কিনা ? জাগলে আমাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে বলেন। আমি তক্ষুনি ক্ষমতা ছেড়ে দেব। ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য আমাকে এবং আমার ছেলে ও স্ত্রীকে যেন হত্যা করা না হয়।[৪৪]

---

৪০) ডঃ গোলাম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮।

৪১) হাসান উজ্জামান, "সামরিক শাসন ও বর্তমান রাজনীতি" এশীয় গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা, এশীয় গবেষণা কেন্দ্র, গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট পলিটিক্স বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৬, মে ১৯৮৪।

৪২) হাসান উজ্জামান, সামরিকবাহিনী এবং বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি, ঢাকা, ঘাসফুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, পৃঃ ১৫।

৪৩) ডঃ গোলাম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

৪৪) আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদের এই সাক্ষাতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি বাংলাদেশের ডিক্টেটর ছিলেন, কিন্তু একক ডিক্টেটর ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্পোরেট ডিক্টেটর।

কিন্তু গণ আন্দোলনের চাপে সামরিক বাহিনী যখন দেখতে পেলো এরশাদ সরকার কে দিয়ে আর চলছে না তখন তাদের সমর্থন শেষ পর্যায়ে প্রত্যাহৃত হলো। তবে সেনাবাহিনী শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল। এ ব্যাপারে ঢাকার একটি সাপ্তাহিক "এরশাদের পতনের আগে ক্যান্টনমেন্টে যা ঘটেছিল" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১লা ডিসেম্বর '৯০ সকালে সেনা প্রধান দেশে ফেরত আসেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেনা প্রধানের নির্দেশে ঢাকা সহ দেশের সকল এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নে প্রকাশ পায় যে, জরুরী অবস্থা ও কারফিউ জারি এবং সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়নি।[৪৫]

যেহেতু সেনাবাহিনী ইউনিট সমূহ বিভিন্ন নগরীতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল। সেহেতু তারা নিজেরাই স্বচক্ষে আন্দোলনকারী জনগনের সক্রিয়তা ও তার ব্যাপ্তী অনুধাবন করতে পেরেছে। সচরাচর যে সকল কাজ পুলিশ বাহিনী করে ঐ সকল কাজ করাও সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এতে আন্দোলনকারী জনগনের সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যগণের মধ্যে একটা পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ নাজুক পরিস্থিতি হতে সেনাবাহিনীকে বিচ্যুত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর তিন বাহিনীর প্রধান তাঁদের পদস্থকর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিস্থিতি যে দিকে এগিয়ে গেছে, তাতে জনগন ও জেনারেল এরশাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য।[৪৬] বিবিসি প্রচারিত এক সংবাদ ভাষ্যে বলা হয় শেষ পর্যায়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এরশাদকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জনমতের বিরুদ্ধে তাহারা আর ব্যবহৃত হইতে রাজী নন। আর তখনই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।[৪৭]

তবে এরশাদের পতনকে তরান্বিত করতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। গণআন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থান ছিল সম্মানজনক। জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামরিক বাহিনী তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে এক করে ফেলেনি। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরুদ্দিন খান সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখেছেন। চেয়েছেন তার রাজনৈতিক সমাধান। একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সঙ্গত কারনে জনগনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন করতে রাজী হয়নি।

সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকার এই সময়ে সামরিকবাহিনীকে ব্যবহার করে সশস্ত্র বাহিনীর সমূহ ক্ষতি সাধিত করেছে। দেশের মানুষের কাছে তাদের ভাবমূর্তিকে প্রবলভাবে বির্তকিত করে তুলেছে। সেনাবাহিনীকে সেই অতীত থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। দেশের মানুষের আকাংখার প্রতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সকল সময়ের জন্য। আমরা এইঅভিজ্ঞতারপ্রতিফলন দেখতে পাই সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ নূরুদ্দিন খানের বক্তব্য থেকে। ৬ই ডিঃ টেলিভিশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন- বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে।

---

৪৫) সাপ্তাহিক ঢাকা, ২রা জানুয়ারী, ১৯৯০।

৪৬) দৈনিক আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

৪৭) ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

একনায়ক তন্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক সহযোগীতা করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করেছে।[৪৮]

বিগত দেড় দশকে দেশে হত্যা, ক্যু এবং অভ্যুত্থানের বহু ঘটনাবলীর পর সেনাবাহিনী প্রধানের এই বক্তব্য তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। এটা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক গতি ধারায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জাতীয় নেতৃত্বের দল বিকশিত হয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতীয় অগ্রগতির সূচক। অথচ বাংলাদেশে (৮২-৯০) এই সময়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হয় কলুষিত। হয় সন্ত্রাস কবলিত। একের পর এক ধর্মঘট, বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উন্মুক্ত অস্ত্রের মহড়া এবং দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, বন্দুক লড়াই প্রতিদিনকার রুটিন মাফিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে কারনে অকারনে সামান্য ব্যাপারে একের পর এক বন্ধ ঘোষনা করা হতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যাপারটা বোধ হয় এমন রির্মোট কন্ট্রোল হাতে কারা যেন নব টিপছে আর ছাত্ররা সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং সেই সাথে বন্ধ হয়ে গিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো) ফলে যথা সময়ে পরীক্ষা হতো না, পিছিয়ে যেতো পরীক্ষা। নষ্ট হতো ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান সময়। লাখো লাখো সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশার মাঝে জীবন নিপতিত করতো। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উদাহরন নয় উচ্চ শিক্ষার সব কটি প্রতিষ্ঠানে এই সময় কমবেশী একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

(৮২-৯০) বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন গুলোর দিকে তাকালে নিজেদের অপরাধী মনে হয়। অপরাধী মনে হয় এই কারনে যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬২ শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের যে সুমহান ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করেছি নিছক রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য সেই ছাত্র সমাজকে এই সময়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বৈরাচারী সরকার কিভাবে ব্যবহার করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার নির্মম প্রহসন চালিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট ধরন দেখে।

এটা ঠিক স্বৈরশাসক সব সময়ই চায় ছাত্ররা বিভিন্ন অন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক। দেশে কার্যকর কোন ছাত্র আন্দোলন গড়ে না উঠুক। সন্ত্রাসের কারনে অভিভাবক মহলে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠুক। যাতে করে ছাত্ররা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় কোন অবস্থান গ্রহন করতে না পারে এবং সেই সুযোগে স্বৈরাচারী সরকার তার শাখা প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের ভীতকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। এরশাদ বিশ্বাস করতেন সকলকে কেনা যায়। কিনেছেন ও অনেককে তিনি। বহু ব্যক্তি ছাত্রকে কিনেছেন। কাছাকাছি গিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন,

---

৪৮) দৈনিক আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন ছাত্র সংগঠন গুলো যেন ঐক্যবদ্ধ না হয়। এজন্যে ব্যক্তি শিক্ষকের সেবা ও গ্রহন করেছেন। ছাত্র সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন ছাত্র শক্তিকে শতধা বিভক্ত রেখে নিজেদের সীমানায় বন্দী রাখতে। এ কৌশলে ভালো ফল ও ফলেছে বেশ কিছু দিন। বিভক্ত হয়ে ছাত্ররা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য হয়ে এসেছিল অস্ফুট। ছাত্রদের একাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে অর্থ ও সম্পদের সাহায্যে উৎকোচ দিয়ে তাদের মাস্তানে পরিণত করাটা পুরোনো কায়দা হলেও (৮২-৯০) এ সময়ে তা রীতিমত আর্টে পরিনত হয়েছিল।[৪৯] বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সরকার থেকে নিজস্ব লোক খুঁজে বের করে তাদের হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দেয়া হতো। তাতে লাভ হতো এই যে, নির্দিষ্ট সময় হাঙ্গামা সৃষ্টি করলে ও তার দায় সরকারের উপর পড়তো না। পড়তো ছাত্র সংগঠন সমূহের উপর। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উপর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে (৮২-৯০) এ সময়ে এরশাদ সরকার সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ছাত্রদের উপর কি পরিমান দমন পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছিলেন তার বাস্তব উদাহরন হিসেবে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিবেশের কয়েকটি খন্ড চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

২৪শে মার্চ রাতেই ছাত্ররা সামরিক শাসন জারীর প্রতিবাদ করলে পর দিন সন্ধ্যা বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস গুলো আক্রান্ত হয়। সামরিক বাহিনীই হল গুলোতে চলে আসে। প্রচন্ড ত্রাস সৃষ্টি করে। সামরিক সরকারের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালযের সমস্ত পোষ্টার তোলা হয়। সামরিক বিধিবলে ৫ জনের বেশী একত্রে জমায়েত নিষিদ্ধ করে। এমনকি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্যে ও রমনার পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেয়।[৫০]

'৮২-র ৭ই নভেম্বর উপলক্ষে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একমিছিলের আয়োজন করে। মিছিল চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করেই পুলিশ অকস্মাৎ মিছিলের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশের সাথে ছাত্রদের খন্ড যুদ্ধ।এসময় মধুর ক্যান্টিনে অবস্থান রত অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা ও পুলিশ প্রতিরোধে এগিয়ে এসে অংশ গ্রহন করে। ক্রমাগত কাঁদানে গ্যাস ও গুলি সমগ্র ক্যাম্পাসকে কাঁপিয়ে তোলে। রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আমিন ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদা খাতুন নিজেদের কক্ষে বসে টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেয়া অবস্থায় পুলিশ কক্ষে ঢুকে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তাদের লাঞ্ছিত করে। পুলিশ সমগ্র ক্যাম্পাসে ঢুকে শ্রেণী কক্ষের কাঁচের জানালা ভাঙতে থাকে এবং জানালা ফুটো করে গ্যাসের সেল ক্লাসরত ছাত্র-শিক্ষকদের উপর মারতে থাকে।[৫১] এভাবে সমগ্র ক্যাম্পাসে এক বিভীষিকাময় ঘটনার উদ্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সামরিক সরকারের এই হস্তক্ষেপকে নজীরবিহীন ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন।[৫২]

এই সময়ে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে। একদিকে রাজনৈতিক দল অন্যদিকে সরকার তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাপ প্রয়োগের জন্য যেন

৪৯) এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।
৫০) মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।
৫১) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।
৫২) মোহাম্মদ খোশরু, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময়কাল), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ে অস্ত্রের ব্যবহার রাজনৈতিক ভাবে অনুমোদিত হয়েগেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব দলের প্রভাব আছে সবগুলো রাজনৈতিক দল রাজনীতি ক্ষেত্রে এ সময়ে কম বেশী অস্ত্রের ব্যবহার অনুমোদন করে। এর কারণ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে পৌছানোর চেষ্টা। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রথম সোপান হিসাবে ধরা হয় ছাত্রাবাস ও ইউনিয়ন দখল। এই ক্ষমতা কিসের এবং কোথায় তার উত্তর সহজ। ছাত্রাবাস গুলোতে প্রভাব বিস্তার করা হোক, সেখানে কেবল নিজ দলীয়রাই থাকবে। লক্ষ্য ইউনিয়ন নির্বাচনে জয় লাভ এবং ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল। কিভাবে সে জয় আসবে কিভাবে ক্ষমতা দখলে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা দখল। সেই ক্ষমতা কলেজগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে সরকার পক্ষের শক্তি বা বিপক্ষের শক্তির ঘাঁটি। অর্থ্যাৎ জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ঘাঁটি হয়েছিল বিদ্যাপীঠ গুলো। এইভাবে বিভিন্ন মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবহার করেছে। তবে শিক্ষাঙ্গনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল অস্ত্র। গোড়া থেকেই এক শ্রেণীর তরুনের হাতে অস্ত্র ছিল। পরে আরো অস্ত্র ও অর্থের যোগান দিয়েছে সরকারের একটি বিশেষ এজেন্সি। ফলে বিভিন্ন ছাত্র দলের ছত্রাবরনে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে অস্ত্রের মহড়া চলতো। যার জের হিসেবে ছাত্র সংগঠনের দুটো দলের মধ্যে বন্দুক লড়াই নিত্য দিনের চিত্র হয়ে দাড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক লড়াই এবং হলে দখলের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

১৯৮৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সরকার সমর্থক নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের অস্ত্রধারীদের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত করলে ক্যাম্পাসে কিছু সময়ের জন্য শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু ৮৬-র মে-জুন মাসে বিরোধী জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস গুলো দখলে এনে শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। ২৫ জুন (৮৭) এই দুদলের সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত হয় এবং ছাত্রাবাস গুলো সেবানন নগরীতে পরিনত হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৮২-৮৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি সংঘর্ষ হয়েছে। এই একই সময়ে ছাত্র সংগঠন গুলোর মধ্যে বিরোধের ফলে ১১টি ছাত্রাবাস ভস্মীভূত হয়েছে। ছাত্রাবাসের ২১টি কক্ষ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। ১৪২টি বাস, মিনিবাস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রসংগঠন গুলির আন্তঃ বিরোধের সংঘর্ষে অস্থির হতে থাকে ক্যাম্পাস। প্রতিদিনই ছাত্রসংঠনের বিভিন্ন উপদল একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি, বোমাবাজি চালাতে থাকে। বিভিন্ন উপদলের লাগাতার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভীষিকা নেমে আসে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার চাইতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রবনতা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ছাত্র সংগঠন গুলো সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে কখন প্রতি পক্ষের দুর্বল জায়গায় পাওয়া যাবে।

এই সময় ছাত্রাবাস গুলো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে স্মরনকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ৮৬-৯০ এর ৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস গুলোতে ৩০ বার তল্লাশী হয়েছে। তবু ও বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্র ও সন্ত্রাস মুক্ত হয়নি। ১৯৮৫ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ৯০ এর ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত এই তল্লাশি অভিযানগুলো চালানো হয়।[৫৪]

---

৫৩) পূর্ণিমা, ১৪ই মার্চ, ১৯৯০।

৫৪) ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও খোলা থাকার খতিয়ান

শিক্ষাবর্ষ (জুলাই-জুন)	অনির্ধারিত বন্ধ	মোট বন্ধ অনির্ধারিত বন্ধ + নির্ধারিত ছুটি	শিক্ষা দিবস হয়েছে	শিক্ষা দিবস হওয়ার কথা
১৯৮০-৮১	১৭দিন ছাত্র ধর্মঘট ২৬ দিন শিক্ষক ধর্মঘট	১১৯	১৭০	২১৩
১৯৮১-৮২	১০দিন ছাত্র ধর্মঘট ৯৪ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৬৮	১৯৭	২০৭
১৯৮২-৮৩	১১দিন ছাত্র ধর্মঘট ৩৩ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২১৮	১৪৭	২২৪
১৯৮৩-৮৪	১১দিন ছাত্র ধর্মঘট ১২২ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯৬	১৬৯	১৯৯
১৯৮৪-৮৫	১৭দিন ছাত্র ধর্মঘট ১৬ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২৬৫	১০০	১৮৯
১৯৮৫-৮৬	৫০ দিন ছাত্র শিক্ষক ধর্মঘট ৩৫ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯২	১৭৩	২০৬
১৯৮৬-৮৭	২৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট ৬৪ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯১	১৭৪	২২৪
১৯৮৭-৮৮	১৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট	১২২	১৮৫	১২৭

তথ্য সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৯।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্যাম্পাসে মিছিল, মিটিং চলাকালে বিবদমান ছাত্র সংগঠন গুলোর ৪ বছরে অন্ততঃ ১৫ বার সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয়। সংঘর্ষ ঘটেছে ২০ বার। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ২০ বার। ৮ বার ঘটেছে অগ্নি সংযোগের ঘটনা। প্রকাশ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ২৫ বার। এই সময়ের মধ্যে বিস্ফরন ঘটানো হয়েছে প্রায় পাঁচশত ককটেল ও হাত বোমা।[৫৫] সংবাদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ছাত্রনেতা বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অভিযানের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমানিত হল অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাসে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকে। এসব সংগঠন অস্ত্রধারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করছে এবং সরকার এর সুযোগ নিচ্ছে।[৫৬] ১৫ই অক্টোবর (১৯৯০) যখন তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনার অধিকার সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ সরকার জারী করেন। সমগ্র ও শিক্ষিত সচেতন মহল সরকারের এই পদক্ষেপের নিন্দা করেন। উর্ধ্বতন সরকারী ও রাজনীতিদের বেশীর ভাগ সন্তান বিদেশে লেখা পড়া করে বলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো দিনের পর দিন এভাবে বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও তার ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন গুলো এমনি একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে থাকে। আর সুযোগ নিয়ে এরশাদ সরকার জোর পূর্বক ক্ষমতা আকঁড়ে রাখার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে চরম আঘাত হানে। জরুরী অবস্থা, কারফিউ জারী করে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুল বন্ধ করে দেয়। পাইকারী হারে ছাত্রদের গ্রেফতার ও দমননীতি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র মাস্তান ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রে পরিনত করে।

৫৫) সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৯।

৫৬) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিলনা। স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকার উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে এ সময়ে যে জগন্যতম বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়েছিল সমস্ত বিবেকবান মানুষের হৃদয় তাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

নির্বাচন

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান। বলা যেতে পারে সিভিল সমাজের ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যম নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনীতি বিকাশের সুষ্ঠ ও সুস্থ পথ খুঁজে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার জন্য সুস্থ রাজনীতির বিকাশের জন্য নির্বাচন প্রয়োজন। এদেশের মানুষ নির্বাচনমুখী। যে কোন নির্বাচনে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি নেই। বৃটিশ প্রবর্তিত এই নির্বাচনকেই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবে। নির্বাচন একদিকে যেমন আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনি সাংগঠনিক তৎপরতা। যে ব্যক্তি নির্বাচনে গণসমর্থন লাভকরেন তিনি হয়ে উঠেন স্বতন্ত্র। লাখো জনতার ক্ষমতার প্রতীক। নির্বাচনে জনগন ও লাভ করে এক চেতনা। নির্বাচন এ জন্যেই এত মূল্যবান। জনগন হয় সচেতন নির্বাচিত প্রতিনিধি ও হন সচেতন তার ভূমিকা ও ক্ষমতা সম্পর্কে।

নির্বাচন পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে দেশের জনগনের আশা আকাংখা হয় প্রতিফলিত সেই নির্বাচন পদ্ধতি বাংলাদেশে (৮২-৯০) সময়ে পরিনত হয়েছিল এক প্রহসন ও তামাশায়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন প্রথাকে এমন ভাবে বিনষ্ঠ করা হয়েছিল যে, সিভিল সমাজের যেন সম্পূর্ন আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে এবং তারা নির্ভর করে সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর। বাংলাদেশে (৮২-৯০) নির্বাচনের নামে এমন প্রহসন পৃথিবীর আর কোন দেশে হয়েছে কিনা জানা নেই। এই সময়ে প্রহসন ও জোচ্চোরির মাধ্যমে নির্বাচন নামক একটি ইনষ্টিটিউটকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়া হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন নামক একটি জননন্দিত প্রতিষ্ঠানকে হাস্যস্পদ করে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) সময়ে নির্বাচন গুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে সামরিক শাসনের অধীনে এবং স্বৈরাচারী কায়দায়। এই সময়ের ভেতর যে কটা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটির চেহারা একই। ভোট না থাকলেও চলবে। ব্যালট বাক্স ভরলেই হলো। পছন্দমত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হবেনই। সরকার বিভিন্ন নির্বাচনে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার পূর্বক ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ভোটের ফলাফল নিজ অনুকূলে গণ প্রচার মাধ্যমে ঘোষনার ব্যবস্থা করেন। পেশী শক্তি ও অর্থবলের অশুভ প্রভাবের জন্য এই সময়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জনগনের আস্থা ছিল না। এরশাদ সরকার তাঁর নিয়ন্ত্রনে নির্বাচনব্যবস্থা দুমড়ে মুচড়ে যেভাবে জনগনের কাছে অর্থহীন করে তুলেছিল তাতে জনগন রাজনীতি বিমুখ হয়েছিল। এই সময়ে প্রধান প্রধান নির্বাচনে মূল বিরোধী দল গুলো অংশ গ্রহন না করায় এবং সরকারের ইচ্ছানুযায়ী সাজানো নির্বাচন করাতে দেশ ও বিদেশে এই নির্বাচনের কোন মূল্য ছিলনা। ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এবং ভোট দেয়ার প্রতি জন সাধারণ হারিয়ে ফেলেছিল আগ্রহ।

এরশাদ সরকার রাজনৈতিক মহলে নিজেকে গ্রহনযোগ্য করার জন্য (৮২-৯০) এই সময়ের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি গণভোট, দুটি সংসদ নির্বাচন এবং একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভার নির্বাচন এবং উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এই নির্বাচনের সবগুলোই ছিল প্রহসনের ও লোক দেখানো নির্বাচন।

Dhaka University Institutional Repository

সবগুলোর চেহারাই ছিল অত্যন্ত কদর্য। কোনটিই অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়নি। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রপতির গদি আকঁড়ে থাকলেও এরশাদসরকারের শাসনের পেছনে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছিল না। ছিলনা কোন বৈধতা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে যে একটি গণভোট, দুটি সংসদ এবং একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে গুলোর অবস্থান এবং নির্বাচনী পরিবেশ তুলে ধরা হলো। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এই সময়ের জাতীয় পর্যায়ের গণতন্ত্রের চিত্রটা জনগনের কাছে স্পষ্ট হবে।

গণভোট ১৯৮৫ মার্চ

জেনারেল এরশাদ তাঁর সরকারের নীতি ও কর্মসুচীর প্রতি সমর্থন চেয়ে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ এক গণভোটের আয়োজন করেন। গণভোটের প্রশ্নটি ছিল এ রকম "আপনি কি রাষ্ট্রপতি এরশাদের নীতি ব্যবস্থা সমূহকে সমর্থন করেন এবং আপনি কি চান একটি বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকার পরিচালনা করেন" ?[৫৭] সকল রাজনৈতিক দল ও জোট গণভোট বর্জন করে। গণভোটে অংশ গ্রহন ছিল নেতিবাচক। শতকরা পাঁচ জন লোক ও ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে যায়নি। ২২শে মার্চ ৮৫ নির্বাচন কমিশন জানায় রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৯৪.১৪% আস্থা ভোট পেয়েছেন। না ভোটের হার ছিল ৫.৫০ শতাংশ। মোট ভোটার সংখ্যা ৪ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ৯শ ৬৪ জন। এর মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লাখ ৬৩ হাজার ৪শ ৪২ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ শতকরা ৭২ ভাগ ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছে। বিদেশী সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা গুলো জানায় যে উক্ত গণভোটে শতকরা ৪/৫ জন লোক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।[৫৮]

'দি টাইমস' প্রতিনিধি বলেন, "কি করে মিথ্যাচার সহ্যকরে বাঁচতে হয় সে সম্পর্কে গতকাল (২২শে মার্চ) বাংলাদেশ শিক্ষা লাভ করে। দেশের স্বৈরশাসককে গণভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রী বলে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি প্রতারনা মাত্র"।[৫৯] ঢাকা এলাকার একটি ভোট কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত হতাশা গ্রস্থ অথচ সৎ অফিসার বলেন, ১৬ জনের ও কম ভোটার ভোট দানের জন্য আসেন। সরকারী কর্মচারী হিসেবে ভোট না দিয়ে তাদের কোন উপায় ছিলনা।[৬০] গণভোট সম্পর্কে এরশাদ সরকারের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমান খান, তাঁর "প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'ভোটের দিন ধামরাই এলাকার ১০/১২ টি কেন্দ্র ঘুরিয়া দেখিলাম। সর্বত্রই একই অবস্থা ভোটারদের উপস্থিতি খুব নগন্য। ঘুরিয়া ফিরিয়া এক স্থানে বিশ্রাম নিতেছি এমন সময় কয়েক জনকর্মী আসিয়া জানাইল যে, স্যার কয়েক হাজার ভোট দিয়া এলাম, বল কি ? এটা কেমন করে হল ? বলিল, খুব সোজা। প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষ বলতে তো কেউ নেই। আমরাই কেন্দ্রের পরিচালক। বাক্স ভরে দিলাম।[৬১] লন্ডনে প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীরাই জানাইয়াছে যে, ওখানকার পত্র-পত্রিকায় শতকরা ৪/৫ জন লোক ভোট দিয়েছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।[৬২]

---

৫৭) ডঃ গোলাম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
৫৮) ঐ পৃঃ ২০১।
৫৯) দি টাইমস, লন্ডন, ২৩শে মার্চ, ১৯৮৫।
৬০) ঐ।
৬১) আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, নওরোজ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৪৬।
৬২) ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৭ই মে, ১৯৮৬

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সামরিক আইনের অধীনে ১৯৮৬ সালের ৭ই মে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জেঃ এরশাদ এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনী লড়াই মূলতঃ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের অন্য বৃহৎ রাজনৈতিক দল বি এন পি কে এরশাদ উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহন করাতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন এমন এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় যখন বি এন পি এবং আওয়ামী লীগ এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন পরিচালনা করছিল।

নির্বাচনের শুরু থেকেই নির্বাচনী বিধি নিষেধ ভঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী ও মেজর জেনারেল শামসুল হক ও প্রার্থী হন। এরা দু'জনই ছিলেন মন্ত্রীসভার সদস্য। "উল্লেখ্য যে, সরকারী বিধি অনুযায়ী সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত কোন ব্যক্তি নির্বাচন প্রার্থী তো দূরের কথা, কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও হতে পারেন না"।[৬৩] ৬ই মে '৮৬ ঢাকা থেকে 'দি গার্ডিয়ান' ও ফাইনান্সিয়াল টাইমস এর সংবাদ দাতা এরিক সিলভার ও জন এলিয়ট কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, আসন্ন নির্বাচনে ভোট কারচুপি হবে কিনা সেটা বড় কথা নয়, বরং এরশাদের জাতীয় পার্টিকে ভোটাধিক্য দেওয়ার জন্য কি পরিমান কারচুপির আশ্রয় গ্রহন করা হবে এবং কতটা রেখে ঢেকে তা করা হবে সেটাই বিবেচ্য।[৬৪] অর্থাৎ এরশাদ ভোট কারচুপির আশ্রয় গ্রহন করবেন এসমন্ধে তারা নিশ্চিত।

৭ই মে, ৮৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটাকে নির্বাচন না বলে নির্বাচনী প্রহসন বলাই শ্রেয়। সারা দেশে ব্যাপক গোলযোগ, সীমাহীন সন্ত্রাস, হাজার হাজার ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়। যার যেখানে বাহুবল ও শক্তিবল বেশী সেখানে সেই প্রার্থী বা প্রার্থীর লোকজন সব ভোটকেন্দ্র দখল করে ফ্রি স্টাইলে ভোট কেটে অস্ত্রের জোরে প্রিজাইডিং অফিসারদের স্বাক্ষর নিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে বিজয়ী বলে ঘোষনা দিয়েছেন। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ উভয়েই ব্যাপক সন্ত্রাস ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। প্রায় ভোট কেন্দ্রেই জনগণ ভোট দিতে গিয়ে দেখে যে, সকাল এগারটার মধ্যেই ভোট দেয়া শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রে জনগনের যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি।[৬৫] অবাধ নির্বাচন ও গণ কমিশনের আমন্ত্রনে বৃটিশ পার্লামেন্টের দু'জন সদস্য ও বিবিসির একজন সাংবাদিক ঢাকায় আসেন নির্বাচন পর্যবেক্ষনে "তাঁরা এক যুক্তিবিবৃতিতে বলেন" যদিও তাঁদের তিনজনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিস্কার ও অভিন্ন। এতে অপরাহ্নে সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা ভোট গ্রহন নস্যাৎ করার কথা বলা হয়। তাঁরা লাঙ্গল ব্যাজধারীদের (জাতীয় পার্টি) উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনে কারচুপির জন্য প্রধানত জাতীয় পার্টি দায়ী। যে নির্বাচন বাংলাদেশে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারতো ও হওয়া উচিত ছিল তাকে জাতীয় পার্টি গণতন্ত্রের জন্য ট্রাজেডিতে পরিণত করেছে"। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী (১) এমন কোন আসন খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে জাপা প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন অথচ সন্ত্রাস হয়নি। (২) বাংলাদেশে ইতিঃ পূর্বে কখনও ভোট কেন্দ্রে সেনাবাহিনী দেখা যায়নি যা এবার দেখা গেছে। (৩) "বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেতার-টেলিভিশনে যেভাবে ফলাফল রদবদল ঘোষিত হয়, সন্ধ্যা ছ'টায় ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয় তাতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কু ঘটেছে বলে জনমনে প্রবল সন্দেহ ছড়িয়ে পড়েছে"।[৬৬]

---

৬৩) একতা, ২১/০৩/১৯৮৬।

৬৪) বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৪ই মে, ১৯৮৬, মতিউর রহমান চৌধুরীর লেখা, বিদেশী সাংবাদিকদের চোখে।

৬৫) কবির আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

৬৬) একতা, ০৯/০৫/১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬, নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ ৭ মে ১৯৮৬, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা, প্রাপ্ত সর্ব মোট ভোট এবং প্রাপ্ত আসন সংখ্যা সূচক বিবরণী।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটে শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	জাতীয় পার্টি	৩০০	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪ %	১৫৩
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬%	৭৬
৩.	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ	১০৩	৪,১২,৬৫	১.৪৫%	৪
৪.	জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭৬	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১%	১০
৫.	ইসলামী যুক্তফ্রন্ট	২৫	৫০,৫০৯	০.৯৮%	-
৬.	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৯	২,৫৯,৭২৮	০.৯১%	৫
৭.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১০	২,০৩,৩৬৫	০.৭১%	২
৮.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১০	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯%	৫
৯.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬	১,৯১,১০৭	০.৬৭%	৩
১০.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	১,৫১,৮২৮	০.৫৩%	৩
১১.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম এল)	৬	৩৬,৯৪৪	০.১৩ %	-
১২.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১৩৮	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪%	৪
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান সিরাজ)	১৪	২ ৪৮,৭০৫	০.৮৭%	৩
১৪.	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	৭	২২,৯০১	০.০৮%	-
১৫.	জনদল	৩৪	৯৮,১০০	০.৩৪%	-
১৬.	গণআজাদী লীগ	১	২৩,৬৩২	০.০৮%	-
১৭.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৯	১,২৩,৩০৬	০.৪৩%	-
১৮.	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৬	২,৯৯৭	০.০১%	-
১৯.	বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	১৪	৬৮,২৯০	০.২৬%	-
২০.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১	১,৯৮৫	০.০১%	-
২১.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	১	১৪৯	০.০০১%	-
২২.	বাংলাদেশ ইসলামী রাজনৈতিক পার্টি	১	১১০	০.০০০৪%	-
২৩.	বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট	৪	১,৩৩৮	০.০১%	-
২৪.	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি	১	১৪১	০.০০০৫%	-
২৫.	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম	১	৫,৬৭৬	০.০২%	-
২৬.	পার্টি	১	৫,৫৭২	০.০২%	-
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি (অদুদ)	৫	৪৬,৭০৪	০.১৬%	-
২৮.	জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)	১	১,৯৮৮	০.০১%	-
২৯.	স্বতন্ত্র	৪৫৩	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯%	৩২
	সর্ব মোট	১,৫২৭	২,৮৫,২৬,৬৫০		৩০০

দ্রষ্টব্য ঃ এই নির্বাচনে কেউই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। মহিলা আসন সহ জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১৫৩+৩০ আসন।

তথ্য সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রকাশিত।

উৎস ঃ মাহমুদ শফিক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, পৃঃ ৬৩।

৯ই মে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনা করা হয়। আওয়ামী লীগ ৯ই মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর পরই এ নির্বাচনকে ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন এবং সরকারী দল ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। পক্ষান্তরে জাতীয় পার্টির মহাসচিব একই দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি করেছে। অর্থাৎ নির্বাচনে যে গণহারে কারচুপি হয়েছে তা জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ উভয়েই স্বীকার করেছে।[৬৭]

৬৭) দি টাইমস্, লন্ডন, ৮ই মে, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৮ই মে, ৮৬ নয় জন বিদেশী সাংবাদিকের সাথে আলোচনা কালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, মাত্র, কয়েকটি ভোট গ্রহন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের সংঘর্ষ স্বাভাবিক ব্যাপার। নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের আহবায়ক কে এম, সোবহান বলেন, নির্বাচনের ফলাফলে জনগনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি।[৬৮] বিরোধী দল কর্তৃক আমন্ত্রিত একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল এই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য একটি বিয়োগান্ত ঘটনা বলে অভিহিত করেন।[৬৯] এই প্রহসনের নির্বাচন সম্পর্কে এরশাদ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তার "প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস" গ্রন্থে লিখেছেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে বলল, আমার এলাকায় একটা রেকর্ড হইয়াছে। মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা, আমি ভোরে জীপ নিয়া এলাকা ঘুরতে গেলাম। ৮/১০টি কেন্দ্রে গিয়া দেখি কোন লোকজন নাই। প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার চুপচাপ বসা। একটা মানুষ ও নাই। বেলা ১১টার সময় রাস্তায় দেখি একজন চেয়ারম্যান সদল বলে আসিতেছে। আমাকে দেখিয়াই বলিল। স্যার এইট্রি পারসেন্ট দিয়াছি। আর দিতে মানা করিয়াছি। অবাক হইয়া গেলাম এই দৃশ্য দেখিয়া। বোধ হয় এটা ও এক রেকর্ড।[৭০]

তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৬

বাংলাদেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জেনারেল এরশাদের অধীনে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৬। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এরশাদ ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মূল বিরোধী দল গুলো অংশ নেয়নি।

তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৬

	মনোনীত প্রার্থী	রাজনৈতিক দল / স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত সর্ব মোট ভোটে সংখ্যা
	হুসেইন মোঃ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	২,১৭,১৭,৭৭
	মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজী হুজুর	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৪,৭৮,৭২৩
	লেঃ কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান	স্বতন্ত্র	১১,৭৩,৭২৩
	মোঃ আসনার আলী	মজলিসে গাউসে যমান	১,১৬,৯২৩
	মেজর (অবঃ) মোঃ আকসার উদ্দিন	বাংলাদেশ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পরিষদ	১,১১,৫৪২
	মোঃ আব্দুস সামাদ	বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি	১,১৪,১১৬
	সৈয়দ মনিরুল হুদা চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৮৮,৫০২
	মোহাম্মদ জহির খান	ন্যাশনাল রিপাবলিক পার্টি	৪,১৮,৭৪৪
	মওলানা গায়রুল ইসলাম যশোরী	আওয়ামী ওলামা পার্টি	৩,৫০,৩৯১
	খন্দকার আজিজুল হক	স্বতন্ত্র	১,৫৬,৩২৮
	অলিউল ইসলাম মিয়া	বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি	১,৩৪,২১১
	খলিলুর রহমান খান	জাতীয় নাগরিক সংহতি	১,২৩,৪১৭

নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রকাশিত।

উৎসঃ অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ৪৫১।

---

৬৮) কবল আমিন, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ১৭৫।

৬৯) ঐ।

৭০) আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, নওরোজ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭১-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী হুসেইন মোঃ এরশাদ বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অপর ১১জন প্রার্থী তাঁর বিপুল ভোটের তুলনায় নগণ্য সংখ্যক ভোট লাভ করেন। বিরোধী দলীয় জোটের আহবানে এদিন সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। তাঁরা বলেন ১৫ই অক্টোবর, ৮৬ জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। রাস্তা ঘাট, হাট বাজার ছিল জনমানব শূন্য। শতকরা একভাগ ভোটার ও ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি। কোন কোন কেন্দ্রে দেখা গেছে যে, দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২/১টি ভোট পড়েছে। কিছু অস্ত্রধারী মাস্তান, পুলিশ কর্তব্যরত অফিসারদের সহযোগীতায় স্ট্রি ষ্টাইলে ব্যালটে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করছে।[৭১] রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে সাংবাদিক রুহুল আমিন তাঁর "স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূল ধারার নেতৃত্ব" বইতে তার নিজের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে - ঘটনাটি ঢাকার একটি ব্যতিতম এলাকার একটি ভোটকেন্দ্রের। আমার এক অন্তরঙ্গবন্ধু ঢাকার একটি খ্যাতনামা বেসরকারী কলেজের শিক্ষক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ঢাকার একটি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হয়। সকাল ১১টা এর মধ্যে মাত্র ১টি ভোট পড়েছে। তিনি এবং পোলিং অফিসাররা বসে বসে জিম্মুচ্ছেন। হঠাৎ করে কেন্দ্রের সামনে সেনাবাহিনীর একটি জীপ এসে থামলো, জীপ থেকে সেনাবাহিনীর একজন মাঝারি গোছের অফিসার ও কয়েকজন সৈন্য নামলেন। সেনাবাহিনীর অফিসারটি জীপ থেকে নেমে সোজাসুজি গেলেন প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে। সেনা অফিসারটি প্রিজাইডিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন এখন পর্যন্ত ক'জন ভোট দিয়েছে ? উত্তরে তিনি বলেন, মাত্র একজন লোক ভোট দিয়েছে। এতে ক্ষেপে গেলেন সেনা অফিসারটি। সজোরে একটি বেত বসিয়ে দিলেন প্রিজাইডিং অফিসারের গায়ে এবং নির্দেশ দিলেন বেলা দুটোর মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ ভোট যেন কাষ্ট হয় এবং ৯৬% যেন লাঙ্গল মার্কায় দেয়া হয় এবং সেনা অফিসারটি নিজে উপস্থিত থেকে প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদেরকে লাগালেন লাঙ্গল মার্কায় সীল দিতে।[৭২]

১৬ই অক্টোবর ৮৬ বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে আলাপ কালে এরশাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বৈধতা সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বন্ধ করবে বলে দাবি করেছিল, কিন্তু আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছি। এটাই এই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমান। যদি ভোট দাতার সংখ্যা শতকরা তিনজন ও হয় এবং তাদের অধিকাংশ আমার পক্ষে ভোট দান করেন, তাহলে আমিই অধিকাংশ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছি।[৭৩]

চতুর্থ জাতীয় সংসদ, ৩রা মার্চ, ৮৮

১৯৮৭ সালে বিরোধী দলের প্রবল আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংসদ বাতিল করেন এবং সংবিধান মোতাবেক তিন মাসের মধ্যে আর একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ৩রা মার্চ ৮৮ ভোটারবিহীন চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনজোট, জামাতে ইসলামী সহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহ নির্বাচন বয়কট করে। তারা এই ভোট ভোট খেলাকে তামাশা বলে অভিহিত করে। এদিন ছিল তিন জোট, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল আহুত ৩৬ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচীর শেষ দিন। রাজধানী ঢাকা সহ সারাদেশে এই কর্মসূচী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। রাজধানীতে কোন যানবাহন চলাচল করেনি। প্রধান প্রধান রাস্তা গুলো ছিল জন মানব শূন্য।

৭১) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।
৭২) ঐ পৃঃ ১৯৬-৯৭।
৭৩) দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ ৩রা মার্চ ১৯৮৮

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা, প্রাপ্ত সর্ব মোট ভোট এবং প্রাপ্ত আসন সংখ্যা সূচক বিবরণী।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত সর্বমোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটে শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১.	জাতীয় পার্টি	২৯৯	১,৭৬,৮০,১৩	৬৮.৪৪%	২৫১
২.	সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৯	৩	১২.৬৩%	১৯
৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাহজাহান	২৫	৩২,৬৩,৩৪০	১.২০%	৩
৪.	সিরাজ)	১১২	৩,০১,৬৬৬	৩.২৯%	২
৫.	ফ্রীডম পার্টি	৩৩	৮,৫০,২৮৪	০.৪০%	-
৬.	২৩ দলীয় জোট	১৩	১,০২.৯৩০	০.৪১%	-
৭.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১২	১,০৫,৯১০	০.১১%	-
৮.	জনদল	১	২৮,৯২৯	০.০২%	-
৯.	বাংলাদেশ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি	২১৪	৪,২০৯	১৩.৫০%	২৫
	স্বতন্ত্র		৩৪.৮৭.৪৫৭		
	মোট	৯৭৮	২,৫৮,৩২,৮৫ ৮		৩০০

তথ্য সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রকাশিত ।

উৎসঃ মাহমুদ শফিক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, পৃঃ ৬৩

বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের নেতা কর্মীরা রাস্তায় বিশাল মিছিল বের করে। কিন্তু এতো কিছুই দমিত করতে পারেনি স্বৈরাচারী এরশাদকে। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ মাত্র ৪টি দলের অংশ গ্রহনে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৮ জন জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হয়, যা এদেশের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা ছিল।[৭৪] বিশ্বের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম গুলোতে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান সমূহকে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ৪ঠা মার্চ ৮৮ 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় 'বাংলাদেশের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটদাতা ব্যাপক বয়কট-এর মাধ্যমে গতকাল ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রতি তাদের ঘৃনা প্রকাশ করে।[৭৫] নির্বাচনে যে প্রচন্ড কারচুপি হয়েছে সেটা এরশাদ সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন এবং তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে আলাপ কালে বলেন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এ নির্বাচন, এ নির্বাচন সাময়িক। বিরোধী দল গুলো নির্বাচনে অংশ নিতে রাজী হলে, তিনি এ সংসদ বাতিল করে পুনরায় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।[৭৬]

৭৪) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩।

৭৫) দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৮।

৭৬) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন

এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, পৌরসভার নির্বাচন এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা দখল করেই এরশাদ দ্রুত কৌশল করে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। এর ফলে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ জানুয়ারী পৌরসভার নির্বাচন সন্ত্রাস হত্যার অসংখ্য অভিযোগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ যেন তেন প্রকারে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য ওঠে পড়ে লেগে যান। নির্বাচন কমিশন ৮ই এপ্রিল ৮৫ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ত্রতে বলা হয় ৪৬০টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ২০শে মে ৮৫। ১৬ই মে ৮৫ ২৫৪টি উপজেলায় প্রহসন মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যার বেশী প্রভাব প্রতিপত্তি ও টাকার জোর ছিল সেই জয় লাভ করেছে। বেশীর ভাগ প্রার্থী মাস্তান ভাড়া করে গণহারে ভোট কেটে তাদের চুক্তিকৃত প্রার্থীর বাক্স ভরে দিয়েছে। ২০শে মে ৮৫ বাকী উপজেলা গুলোর নির্বাচন একই কায়দায় সম্পন্ন হয়। উপজেলা নির্বাচন ৮৯ অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ সময়ের মধ্যে। সেগুলোর অবস্থাও পূর্বের মতই ছিল।

বাংলাদেশে (৮২-৯০) এ সময়ের স্থানীয় নির্বাচন গুলির সন্ত্রাসের দৃশ্যপট।

এই সময়ে স্থানীয় নির্বাচন গুলো সন্ত্রাসের বধ্যভূমিতে পরিনত হয়ে ছিল।তার বাস্তবও মূর্ত উদাহরন হিসেবে আমরা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন সমুহ বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ,ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরতে পারি। ১৯৮৩-৮৪ এবং বিশেষতঃ ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে সহিংসতার বাড়তি একটি নতুন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। সন্ত্রাস এই পর্যায়ে শুধু রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার হাতিয়ার হিসাবে নয় বরং স্থানীয় জনগনকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে একেবারেই অংশ গ্রহন করতে না দেওয়ার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সন্ত্রাস এখানে নির্বাচনে জনগনের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার হরনের হাতিয়ার হয়ে দাড়ায়।[৭৭] ১৯৮৪, ৮৮'র ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৫ ও ৯০ এর সমস্ত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও সহিংসতার ও অনিয়মের কিছু ধরন যা সংযোজিত করা হয়েছে। কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো যার মাধ্যমে (৮২-৯০) এ সময়ের বাংলাদেশের স্থানীয় গণতন্ত্রের চিত্রটা স্পষ্ট হবে।

যে সমস্ত প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়

১। নির্বাচনে গুলি, বোমাবাজি ছুরিকাঘাতের মত মারাত্মক সন্ত্রাসী তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। (২) জোর করে ব্যালট বাক্স ভর্তি। (৩) ক্ষমতাসীন প্রভাবশালীদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করা। (৪) পুলিশ ও নির্বাচন পরিচালনা কারী কর্তৃপক্ষ কখনও স্বেচ্ছায় কখনও দায়ে এই অশুভ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। (৫) নিহত, আহত ও অপহরনের মত মারাত্মক এবং ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে। (৬) কয়েকটি ক্ষেত্রে ভয়ে প্রিসাইডিং অফিসার পালিয়ে গেছে।[৭৮]

৭৭) হোসেন জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশে (৮২-৯০) স্থানীয় নির্বাচন ও রাজনৈতিক চালচিত্র, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৮ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৭।

৭৮) আজকের কাগজ, প্রবণতা ও ভোট প্রদানের চিত্র, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ভোট প্রদানের চিত্র

(১) বাঁশখালি ঃ এখানে ৯৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টিতে সকাল ৯টার মধ্যে ভোট গ্রহন শেষ হয়ে গেছে। (২) দাউদকান্দি ঃ বেলা বারোটা পর্যন্ত ১ জন মহিলা ভোটার ও দেখা যায়নি। (৩) ভাগলপুর ঃ ৫০/৬০ জন কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৮টার সময় গিয়ে দেখেন তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। (৪) খানসামা ঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনার পর কাগজপত্র সহ নিখোঁজ রয়েছেন। (৫) মোকশেদপুর ঃ অবস্থা বেগতিক দেখে প্রিজাইডিং অফিসার পালিয়ে যান। (৬) শাহজাদপুর ঃ একজন প্রার্থীর পক্ষে ব্যালটে সীল মারার সময় পুলিশ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও তার ছেলেদের আটক করেন। (৭) বাগের হাট ঃ প্রিজাইডিং অফিসার নিরাপত্তার কারনে ভোট গ্রহন বন্ধ রেখে জনগনের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে।[৭৯]

এই ছিল (৮২-৯০) এই সময়ের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের হালহকিকত। আর এভাবেই স্বৈরশাসক এরশাদ চেয়েছিলেন নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে আস্থাহীন করে তুলতে। মানুষ আস্থাহীন হয়েছিল নির্বাচন নিয়ে নয়, বরং এরশাদকৃত নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে। নির্বাচন প্রহসনে অতীষ্ট হয়ে গণতন্ত্র প্রিয় বাংলার মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল এই শ্লোগান "আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশী তাকে দেবো"।[৮০]

১৯৯১ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে এ নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেন "একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে আমি সন্তুষ্ট। তিনি আরো বলেন এক দশক পর আজ আমি ভোট দিলাম। তিনি বলেন সর্বশেষ আমি ভোট দিয়েছি ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয় পার্টির মাস্তানদের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসের কারনে আমি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারিনি"।[৮১]

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যে কোন ন্যায় নিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শর্ত। দেশে আইনের শাসন না থাকলে গণতন্ত্রের দাবি বা প্রতিষ্ঠা দুটো- সমানভাবে মূল্যহীন। অথচ ৮২-৯০ সময়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় বিচার বিভাগ। ক্ষত-বিক্ষত হয় বিচার বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে।[৮২] স্বাধীন বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে জনগনকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। এরশাদ সরকার স্বাধীন বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে বিকৃত করেন। এই বিকৃতি সাধন করা হয় নানাভাবে প্রথমতঃ হাইকোর্টকে বিভক্ত করে জনগনের দোরগোড়ায় বিচার নিয়ে যাওয়ার নাম করে গৃহীত পদক্ষেপ। সামরিক ফরমানের মাধ্যমে তিনি প্রথমে তিনটি পরে আরো তিনটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করেন বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরনের নামে।

---

৭৯) আজকের কাগজ, প্রবণতা ও ভোট প্রদানের চিত্র, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

৮০) আজকের কাগজ, "আমার ভোট আমি দেবো - যাকে খুশী তাকে দেবো" ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৮১) ঐ।

৮২) অজয় রায়, গণআন্দোলনের নয় বছর, (৮২-৯০) মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের একক সত্ত্বা হিসাবে না থেকে পৃথক সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয় সামরিক ফরমানের মাধ্যমে। হাইকোর্টের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন সম্পর্কে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সরকারের এ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরন- এর একটি পদক্ষেপ।[৮৩] বিচারকদের নিয়োগের ব্যাপারটি রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভরশীল করে রেখে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে শুধু ক্ষুন্নই করা হয়নি বিপর্যস্ত করে তোলা হয়। সংবিধানের যে ধারাগুলি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল সেই ধারা গুলিকে পরিবর্তন করে এবং হাইকোর্টের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে আইনের শাসনের মূলে আঘাত করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিচার বিভাগকে ক্ষমতার উচ্চতম মহলের বাধ্য অনুগামীতে রূপান্তরিত করে স্বৈরাচারের ভিত আরো মজবুত ও স্থায়ী করা। বস্তুতঃ নিজেদের শাসন অক্ষুন্ন ও স্থায়ী করার জন্য আইনের শাসনের ভিত্তি মূল ধ্বংস করা হয়েছে সচেতন ভাবে।

সংবাদপত্র

(৮২-৯০) এই সময়ে এরশাদ সরকারের আমলে মৌলিক অধিকার খর্বকারী বিশেষ ক্ষমতা আইনটি গোটা সংবাদ পত্র শিল্পের মাথার উপর ডোমোক্লিসের খড়্গের মতো ঝুলে ছিল। এই আইনের বলে যে কোন সময় যে কোন সংবাদপত্রকে এমন কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে বন্ধ করা যেতো। বন্ধ সংবাদ পত্রের তালিকায় রয়েছে দৈনিক খবর, দৈনিক বাংলার বাণী 'সাপ্তাহিক দেশবন্ধু' খবর, যায় যায় দিন, বিচিত্রা ও আরো কিছু সাময়িকী। বন্ধ সংবাদ পত্রের দীর্ঘ তালিকা প্রমাণ করে, সরকার উদারভাবেই আইনটি প্রয়োগ করেছিলেন।[৮৪] বিদ্যমান- জরুরী অবস্থা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে আরোপিত সরকারী বিধি নিষেধ -এ দুয়ের মধ্যে দিয়ে সংবাদ পত্র গুলোকে এই সময়ে চলতে হত অত্যন্ত সন্তর্পনে। একটু এদিক ওদিক হলেই নেমে আসত পত্রিকা বন্ধের নোটিশ। ফলে সংবাদপত্রের জগত পরিনত হয়েছিল এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে।

সংস্কৃতি

(৮২-৯০) সময়ে ভয়ঙ্কর ভাবে দলিত মথিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। দূর্নীতি ও অরুচির কবলে পড়ে দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো। এরশাদ সরকার দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে অনুপ্রবেশ ঘটানোর পায়তারা করে আসছিল ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই। সংস্কৃতিসেবী হিসেবে নিজেকে ও তার সরকারকে পরিচিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ কারনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একদল বুদ্ধিজীবি ক্রয় করেছিলেন, এশীয় কবিতা উৎসব করেছিলেন। দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় পর্যন্ত তার কবিতা ছাপা হয়েছিল। তারই চরম পদক্ষেপ হিসেবে গঠন করা হয় "সংস্কৃতি কমিশন"। দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় ভাবধারা ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে এই কমিশন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাদের প্রায় কোন স্থান নেই। তারাই হয়েছিল এর সদস্য। কমিশনের একজন সদস্য লিখিত ভাবে অভিযোগ করেছেন। বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটির ক্ষেত্রে যে দুটি সুপারিশ করা হয়েছে তা তাঁর স্বাক্ষরের পর যুক্ত করা হয়েছে।[৮৫]

---

৮৩) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, নব্বই -এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৮।

৮৪) দৈনিক সংবাদ, ২০শে জুন, ১৯৯১।

৮৫) মুনতাসীর মামুন, গণআন্দোলনের পটভূমি, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, নব্বই - এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সকল পর্যায়ের সংস্কৃতিবান মানুষ ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন সংস্কৃতি কমিশন এবং সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবিরা এর প্রতিবাদ করেছেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ও অতিরিক্ত সচিবের দৃষ্টি ঘোষনা ও দারুন অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল বুদ্ধিজীবি মহলে। এর একটি ছিল বাংলা একাডেমীতে ফেব্রুয়ারী মেলা করতে দেয়া হবেনা এবং এশিয়াটিক সোসাইটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনা হবে কারন সেখানে সরকারী অনুদান দেয়া হয়।[৮৬] ঐতিহ্য রক্ষক প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগকে করা হলো খন্ড বিখন্ড। সরকার চেয়েছিল সজীব সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া যাতে রক্ষনশীল সংস্কৃতির বিকাশ হয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরশাদ সরকার যা করতে চেয়েছিলেন তাহলো - (১) প্রলোভন দেখিয়ে বুদ্ধিজীবিদের একাংশকে সামনে নিয়ে আসা এবং তাদের সাহায্যে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সংস্কৃতি অঙ্গনে হতাশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। (২) ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সরকারী নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা এবং এষ্টাবলিশমেন্ট সমর্থিত কালচার বা চিন্তা ভাবনা প্রথমে সুস্থ বা নমনীয়ভাবে, তারপর জবরদস্তি করে ঢোকানো। (৩) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিনষ্ট করন।[৮৭]

এরশাদ সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে যাদের নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন আমলা। ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিশ্বস্ততার কারনে এদের গুরুত্বপূর্ণ পদ গুলিতে বসানো হয়েছিলো। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলেন পাকিস্তানী ও ইসলাম পছন্দ আন্দোলন বিরোধী, দূর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কিছু ব্যক্তি।

কিভাবে এরশাদ সরকার জনমত বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যাবে ১৯৮৮ সালে পেশকৃত সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্টে। এ রিপোর্টের প্রধান দু'জন উদ্যোক্তা হলেন ভাষা আন্দোলন বিরোধী ও প্রতিটি সামরিক সরকারের সমর্থক সৈয়দ আলী আহসান। আর উচ্চকাংখী একজন আমলা ডঃ এনামুল হক।[৮৮] রিপোর্টের প্রনেতারা অধিকাংশই ছিলেন এরশাদ সমর্থক বুদ্ধিজীবি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে, এ রিপোর্টে এমন কিছু নেই যা গণবিরোধী বা বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিরোধী। কিন্তু, রিপোর্টের বিভিন্ন জায়গায় এমন সব উক্তি করা হয়েছে যা আমাদের সংস্কৃতি বিরোধী। যেমন -

"ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান, ধর্ম বিশ্বাসের কারনে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্ব স্রষ্টা। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাস। হিন্দুরা বহু দেবদেবী কিন্তু তারা ও এক পরম পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এই অর্থে যে দেবদেবীদের মাধ্যমে সেই পরম পুরুষের আস্বাদন লাভ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এখানে কেবল মাত্র ধর্মীয় রীতি নীতি এবং অনুশাসনই নিয়ন্ত্রন করেনি বরঞ্চ মানুষের সামাজিক জীবন ধারাকেও প্রভাবিত করেছে। ---- এদেশের সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে বিদ্যমান থাকে।[৮৯]

---

৮৬) মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

৮৭) ঐ পৃঃ ১৩।

৮৮) উদ্ধৃত, মফিদুল হক, সংস্কৃতি বিনাশী স্বৈরাচার, অভ্যুত্থান, পৃঃ ১৩৫।

৮৯) মুনতাসীর মামুন জয়ন্ত কুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনেস্কো ঘোষনারও বিরোধী ছিল এই দলিল। তাছাড়া ডঃ আব্দুল্লাহ আবুমৃতী বলেছিলেন, তিনি এই রিপোর্টে সই করেননি, যদিও তিনি ছিলেন এর সদস্য। অথচ রিপোর্টে তাঁর স্বাক্ষর আছে। এটি খুব স্বাভাবিক ছিল যে, এ রিপোর্টের অধিকাংশ প্রস্তাব হবে গণতন্ত্রায়নের বিপক্ষে। কারণ, সামরিক সরকার কেন সংস্কৃতির বিকাশ চাইবেন, সজীব সংস্কৃতির বিকাশ তো তার পতনই ত্বরান্বিত করবে।[৯০] এ রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর পরই দেশের বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করেন।

এ রিপোর্টের মাধ্যমে "আশির দশকের বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসকের সংস্কৃতি চিন্তার চমৎকার একটি দলিল আমরা পেয়ে যাই। পাকিস্তান যুগের মতো সরাসরি বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা এখানে নেয়া হয়নি। জিয়াউর রহমানের শাসন কালের মতো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধর্মভিত্তিক অপকৌশল আদর্শ দাঁড় করানোর চেষ্টা জোরের সঙ্গে নেয়া হয়নি। বরং আরো সূক্ষ্ম ভাবে, নমনীয় ও পরিশীলিত উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা নিয়ে ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ"।[৯১]

৯০ এর উপান্তে পৌঁছে, পেছনে তাকিয়ে ৯ বছরের বাংলাদেশকে অবলোকন করতে চাইলে দেখা যাবে নানামাত্রিক চেহারা। বাস্তবতার পটভূমিতে এই (৮২-৯০) সময়ে বাংলাদেশের যে সামগ্রিক অবস্থা উন্মোচিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় বড় ধস নেমেছে সমাজের সর্বত্র। ভাঙ্গনের অনিবার্য আগ্রাসন এগার কোটি মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে এবং সর্বপ্রকার মূল্যবোধে। গণতন্ত্র এখানে বন্দী থাকে ইতিপূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায়বেশী। দেশ জোড়া আর্থ কর্মকান্ডের এই যে অবয়ব অবশ্যই তা সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পরিচায়ক নয়। তবে এটাই প্রকৃত অবয়ব। আর তারই প্রতিফলন পড়েছিল সমাজ জীবনের সকল স্তরে। এই প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের ভয়াবহতার উপলব্ধি থেকেই সচেতন মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা মনে করেছিল ঐ অবস্থা চিরস্থায়ী হলে দেশের এবং সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

৯০) মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৯১) মফিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে সামরিক ও স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা ঃ-

১৯৮২ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত গণ আন্দোলন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। নয় বছর ব্যাপী পরিচালিত ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

জেঃ এরশাদের ক্ষমতা দিনতাই ঔদ্বত্য কার্য কলাপে জনমনে প্রথম থেকেই তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। রাজনীতিকে ধ্বংসের চক্রান্ত, ছাত্র-জনতার উপর অমানুষিক নির্যাতন, সামরিক জান্তার অবাধ লুটপাট, বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসের অশুভ পাঁয়তারা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি এদেশের গণতন্ত্র প্রিয় জনগন। জনগনের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার কল্পে এই সময়ে রাজনীতির স্বাপদ সংকুল পথে পা বাড়ালেন দুই নেত্রী এবং শক্তভাবে রাজনীতির হাল ধরলেন। পাশাপাশি অন্যান্য সমমনা রাজনৈতিক দলকে নিয়ে জোট গঠন করে স্বৈরাচার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রের জন্য পরিচালিত জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের স্ব স্ব দাবিতে প্রবল আন্দোলন হয়েছে। শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, কৃষক, ছাত্র, যুব, নারীসমাজ, আইনজীবি, ডাক্তার সাংবাদিক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ এবং পেশাজীবি সর্বস্তরের মানুষই এ সময়ে তাদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমেছে। স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিরা ও বিশেষ তাৎপর্যপূন ভূমিকা পালন করেছে। সাংবাদিকরা লেখা-বলার মাধ্যমে যেমন তারা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তেমনি তাঁরা সময়ের ডাকে রাজপথে নেমে জনতার কাতারে যোগ দিয়েছেন। আগের কোন আন্দোলনে পেশাজীবি ও সংস্কৃতিকর্মীরা এতো প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একযোগে পদত্যাগ করেছেন। চিকিৎসক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ্যে রাজপথে প্রাণ দিয়েছেন। সাংবাদিকরা সত্য সংবাদ গোপন করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনের পর দিন সংবাদ গোপন করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনের পর দিন সংবাদ পত্র বন্ধ রেখেছেন। শিক্ষকরা মিছিল করেছেন। আইনজীবিরা আগাগোড়া অনমনীয় ছিলেন। সংস্কৃতি কর্মীরা পুলিশের হুমকি উপেক্ষা করে চলে গেছেন সামনে। মহিলারা দ্বিধা করেননি মিছিল করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। সরকারী কর্মচারীরা বের হয়ে এসেছে প্রশাসন ভবন ছেড়ে। সর্বোপরি ছিল ছাত্ররা। রাজনৈতিক নেতারা যা পারেন নি তারা তা পেরেছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে। তাদের ঐক্য চাপ সৃষ্টি করেছে অন্য সবার ওপর। ঐক্যবদ্ধ হবার চাপ এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে ঐক্যের।

রাজনৈতিক দল ও জোটের ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) সামরিক ও স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দল গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা রাজনৈতিক দল গুলো কোন সময় একক ভাবে এবং অধিকাংশ সময় জোট গঠন করে পালন করে। রাজনৈতিক দল গুলো এক মুহূর্তের জন্য ও আন্দোলনের মাঠ ত্যাগ করেননি। রাজপথ ছাড়েনি। স্বৈরাচারের সাথে ক্ষনিকের জন্যে ও আপোষ করেনি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রামের আলোক বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। দিশেহারা জাতিকে

Dhaka University Institutional Repository

দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদেরই সুযোগ্য নেতৃত্বে জনতার ধুমায়িত ক্ষোভ প্রজ্জ্বলিত শিখায় পরিনত হয়েছে স্বৈরাচার পতনে। বিপন্ন জাতিকে পতনের শেষ ধাপ থেকে উদ্ধার করেছে এ দেশের সংগ্রামী জনগণ তাদেরই নেতৃত্বে। আন্দোলনের আপোষহীন নেত্রীদ্বয়কে বার বার গৃহবন্দী করে রেখেছে কিন্তু তাতে ও আন্দোলন দমন করতে পারেনি।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে। তিন জোটের যুগপৎ আন্দোলনের মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি এন পির অবস্থান বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সমস্যা সত্ত্বেও দুই দলের মধ্যে যখন কোন বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে তখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম বেগবান হয়েছে। ৮ ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটের পাশাপাশি ৫ দল ও ইউসি এল- ঐক্য প্রক্রিয়া জোট ভুক্তভাবে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছোট দল হলেও একটি শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সামরিক শাসন জারির পর সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদখানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ৮৩ জানুয়ারীতে মওলানা মান্নানের নেতৃত্বাধীন জামায়াতুল মোদারেছিনের এক সভায় এরশাদের একটি উসকানি মূলক ভাষনের প্রতিবাদে দ্রুত আওয়ামী লীগ সহ ১৫টি রাজনৈতিক দলের একটি যুক্ত বিবৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের উদ্ভব ঘটে। এরপর বি এন পির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। পরবর্তীতে চলতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আশু ও জরুরি দাবি হিসেবে ১৯৮৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে দু'টি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ৫ দফার অভিন্ন কর্মসূচী। এই ৫ দফা দাবী রাজনৈতিক জোটকে অনুপ্রানীত করে। দাবী গুলি ছিল -

১। অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে জনগনের সকল মৌলিক অধিকার সহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুণঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই কেবল সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কেবল জনগনের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে। অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারনে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৫। ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেত-মজুরসহ সকলের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১]

১। ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত, আলবদর : গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খন্ড, তোলপাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃঃ ৪১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় থেকেই যুগপৎ আন্দোলনের ধারার সূচনা হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৮৩ সালের ১লা নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবীতে যুগপৎ প্রথম সফল হরতাল হয়। বিরোধী জোট সমূহ ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের ডাক দেয় এবং তাহা বিভিন্ন সময় জটিল রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। ২৯শে নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও এর মধ্য দিয়ে এমনি এক সংকট সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল ও জোট সমূহ ঐদিন সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহন করে। এই অবস্থান ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধের আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

আন্দোলন প্রশমনের জন্য এবং বিরোধী দলের সাথে একটা সমঝোতায় আসার বাহ্যিকভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ৮ ও ৭ দলীয় জোটের সাথে সংলাপে ব্যর্থ হবার পর সরকার তার খুশি মত নির্বাচন করতে চাইলে বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগতির মুখে তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। দুই জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন বিরোধীতার নীতি গ্রহন করলেও বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়। সরকার ১৯৮৬ সালের মে মাসে আবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করে। ১৫ দল সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে। ৭ দলীয় জোট নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে ফলে যুগপৎ আন্দোলনের একটি পর্ব শেষ হয়ে যায়।

কিছু সময় পরে ১৯৮৭ সালের গণবিরোধী বাজেট, জেলা পরিষদ বিল প্রভৃতিসরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলনকে ৮ দলীয় জোট কিছুটা জোরদার করে তুলতে সক্ষম হয়। এই সময়ে বি এন পির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় জোট তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। সংসদ বাতিলের দাবি তোলে জোরে সোরে। এই পটভূমিতে ১৯৮৭ সালের জুন-জুলাই মাসে নতুন করে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে এক দফা অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে অক্টোবর মাস থেকে তা বেগবান হয়ে নভেম্বরের আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। দুই জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার যুক্ত বিবৃতিতে মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অঙ্গীকার মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ এবং প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এরশাদ বিরোধী এক দফা আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক জোট এবং দলগুলোর সমঝোতা ভেঙ্গে পড়েছিল। পুনরায় যুগপৎ আন্দোলন সম্ভব নয় বলেই তখন মনে হয়েছিল। কিন্তু ৯০ এর মধ্য ভাগে তিন জোটের মধ্যে সমঝোতা গড়ে ওঠে এবং ১০ অক্টোবর ঢাকায় ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটের সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নতুন পর্বের সূচনা ঘটে। সেদিন থেকেই এই আন্দোলন অব্যাহতভাবে প্রচন্ড গতিতে বেগবান হয়ে উঠে। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শুরু করে জরুরী আইন কারফিউ এবং হত্যাকান্ড প্রভৃতির পথ গ্রহন করে। কিন্তু রাজনৈতিক দল ও জোট গুলোর সাহসী ও দৃঢ় সংগ্রামের মুখে তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

সামরিক ও স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা লক্ষ্য করা গেছে যে রাজনৈতিক জোট গুলোর সমঝোতা ছিল এই আন্দোলনে বিজয়ের একটি প্রধান শর্ত। সমঝোতার মধ্য দিয়ে আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সমাজের ভূমিকা

সামরিক ও স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেন ছাত্ররা এবং তা সার্থক পরিনতির দিকে নিয়ে গিয়ে বিজয় অর্জনে অবিস্মরনীয় ভূমিকা রাখে তারাই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে তারা আন্দোলনে থাকতে পারেনি কারন যখনই ছাত্র সমাজ আন্দোলন জোরদার করেছে তখনই সরকার দমননীতি ও নানাবিধ চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে তা নামিয়ে দিয়েছে। তবে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের আন্দোলন শুধু ছাত্ররাই করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে অবধারিতভাবে ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে।

১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে সঙ্গে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়নি। দেশের রাজনৈতিক মহল নিরব থাকলেও সামরিক শাসন জারীর প্রতিবাদে ২৪শে মার্চ রাতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের দিন সকাল ১০.০০টায় মধুর কেন্টিন থেকে প্রথম ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিন করে মধুর কেন্টিনে ফিরে আসে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আক্রান্ত হয় এবং সেনাবাহিনী হলগুলোতে চলে আসে। রাতের বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে সামরিক শাসনবিরোধী পোষ্টার লাগাতে গিয়ে তিনজন ছাত্র ধরা পড়ে।

প্রকৃত পক্ষে ছাত্রসংগঠন গুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে ৮২-র এপ্রিল-মে মাস থেকেই। ৮২-এর জুনে প্যালেস্টাইন সংহিত দিবসে সামরিক আইনে কড়া নিরাপত্তা ভেঙ্গে বায়তুল মোকাররম এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে।

ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্ররা বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের উপায় খুঁজতে থাকে। এসময় বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজনৈতিক মহলে পেশ করেন। তিনি সেটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের নিকট ও পৌছে দেন এবং বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের জন্যে তাদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর ১৪টি ছাত্রসংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ কার্যালয় এ সময় ছাত্রদের নিয়ন্ত্রন কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ৮২-র ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরে, শ্রেণীকক্ষে প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর নির্মম হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বৈরাচারের রক্ষকরা। অসংখ্য ছাত্রকে তখন কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সকল রকম নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ছাত্ররা জেঃ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

সামরিক সরকারের ধর্ম ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান গণবিরোধী শিক্ষা নীতি ঘোষনা করলে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। ১৪টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে গণ স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। এতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে নয়া শিক্ষানীতি প্রনয়নের আহবান জানানো হয়। গণস্বাক্ষর অভিযানের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মাঝে সারা দেশে আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। ছাত্র সংগঠন গুলির বিভিন্ন কর্মসূচীর সমর্থক কর্মীদের বাইরে এ সাধারন ছাত্ররা আসতে শুরু করে। ৮৩-র ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্ররা প্রথম ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষা ভবন ঘেরাও আন্দোলনে জাফর এবং জয়নাল সহ বেশ ক'জন ছাত্র নিহত হলে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর সরকার এক তরফা ভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে ছাত্রনেতারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০ দফা প্রনয়ন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ সত্ত্বেও ২৪শে মার্চ ৮৩ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ দফা ঘোষনা করা হয়। ১০ দফা দাবী গুলো হচ্ছে ঃ (১)মধ্য ফেব্রুয়ারীর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করা। (২) মজিদ খানের গণবিরোধী নীতি বাতিল করতে হবে। (৩) সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৪) শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন। (৫) খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাতে দাম কমাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় খাতে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। (৬) মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। (৭) বিরাষ্ট্রীয় করন নীতি প্রত্যাহার করতে হবে এবং সরকারী খাতকে লাভজনক করতে হবে। (৮) সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (৯) অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে। (১০) সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীত বাতিল করে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ দফা দাবী ঘোষনা করলে ছাত্র আন্দোলন ইস্যুভিত্তিক থেকে দফা ভিত্তিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এরশাদসরকার ছাত্রদের একটি মিছিলের ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিলে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেলিম এবং দেলোয়ার। হত্যার প্রতিবাদে ৮৪-র ১লা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশে গণ আন্দোলনের সূচনা হয়। ৮৫-র উপজেলা নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্ররা এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত রূপ দেয়। ৮৩-র ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা দিবস পালনের আহবানে ৮৫-র ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাতে সূর্য সেন হল থেকে সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল বের হয়। জেঃ এরশাদের নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ -এর সশস্ত্র ব্যক্তিরা এই মিছিলে গুলী চালায়। গুলীতে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা রাউফুন বসুনিয়া নিহত হলে সারা দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের ব্যাপকতা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৮৬ ও ৮৭- এর রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের আত্মনিবেদিত ভূমিকা এদেশের ইতিহাসে ছাত্রদের গৌরবজনক অধ্যায়কে আরো বেশী সমৃদ্ধ করে। ৮২--এর পর ৯ বছর ব্যাপী আন্দোলনের তুঙ্গস্পর্শী পর্যায় ৯০-এর ১০ই অক্টোবর থেকে শুরু-ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব যাতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ই অক্টোবর ৯০ মিছিল, সমাবেশ থেকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল চারজন। বুলেটবিদ্ধ মৃত্যুকে বরন করতে হয়েছিল গণতন্ত্র চাওয়ার শাস্তি হিসেবে। ছাত্র হত্যার বর্বরতায় রুখে দাঁড়ায় গোটা ছাত্র সমাজ রক্ত ছোঁয়া শপথে গড়ে ওঠে ২২ ছাত্র সংগঠনের ঐক্য- সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। এ শপথ স্বৈরাচারের সমূল উৎখাতের, গণতন্ত্রের বিজয় সম্পূর্ণ করার।

আদর্শ গত সকল দ্বন্দ্ব অনৈক্যের সকল সিদ্ধুটানের উর্ধ্বে ওঠা এই মহান ঐক্য সরকার বিরোধী আন্দোলনকে টেনে নয় চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে। ১১ই অক্টোবর পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জে আহত হয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ। ছাত্র ঐক্যের আন্দোলন আরও বেশী বিশালতায় মহিমান্বিত হয় এর পর। নেতাদের কেনার চক্রান্ত হয়, ছাত্রনেতাদের প্রাণনাশের হুমকি আসে। কোন কিছুতেই বিন্দু মাত্র টলে যায়নি ছাত্রঐক্য। রাজনৈতিক দল গুলোর ঐক্যের অসম্পূর্ণতাকে ঘুচে মুছে দেয় রাজপথে ছাত্র ঐক্যের ইস্পাত কঠিন ঐক্য, আন্দোলনে দৃঢ়তা। কারফিউ চলাকালীন সময়ে পোলাপ শাহ মাজারে ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ চরম পুলিশী নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যে আলোর সুস্পষ্ট ঠিকানা ছাত্র ঐক্য রচনা করে প্রতিকূল সময়ে, ক্রমেই তা বিকশিত হতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃশাসনে শ্বাসরুদ্ধ জনতা মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পায় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে। গণ অভ্যুত্থানের ভিত রচিত হয় ছাত্রঐক্যের ভিত্তিতে। ছাত্র ঐক্যের ক্রমবিকাশমান শক্তিতে ভীত স্বৈরাচার মরিয়া হয়ে লেলিয়ে দেয় অস্ত্রধারী মাস্তান বাহিনীকে। ২৫শে নভেম্বর থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের অবিরাম বুলেট বৃষ্টিকে গুড়িয়ে দেয় ছাত্র ঐক্য- সকল ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত প্রতিরোধ। কোন পরাজয় হয়, পিছুটান নয়, দ্বিধা নয়- ছাত্রঐক্য গণ আন্দোলনের আলোক বর্তিকা নিয়ে এগিয়ে যায় সকল প্রতিকূলতার মাঝে। ২৭শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারীর পর তাৎক্ষনিকভাবে ছাত্ররা অস্বীকার করে কালো আইনকে। জরুরী অবস্থার মধ্যে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে প্রথম মুক্তাঞ্চল, যা ক্রমেই সারা দেশব্যাপী প্রচারিত হতে থাকে ছাত্র ঐক্যের হাত ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গণ-আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান '৯০ এবং সামরিক ও স্বৈরশাসকের পতন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণআন্দোলন শব্দটি অত্যন্ত সুপরিচিত। আর গণআন্দোলনের জোয়ার ভাটাতেই এখানে নির্ধারিত হয় রাজনীতির গতিপথ। গণআন্দোলনের ঐতিহাসিকতাতেই বাংলাদেশ গৌরবময় ঐতিহ্যগুলো ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, গনদাবির কেন্দ্রীভবন, স্বাধীনতা অর্জন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী এবং তার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কালপর্বে গণআন্দোলন হয়েছে এদেশে। তবে ১৯৬৯ থেকে ৯০ হচ্ছে গণআন্দোলনের স্বর্ণপ্রসবিনী কালপর্ব। এ সব গণআন্দোলন জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কখনও গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কখনও তৈরী করেছে প্রতিশ্রুতির।

কোন দেশের ক্ষমতাসীন সরকার যখন তার স্বৈরাচারী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও পেশাজীবি সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু এক পর্যায়ে আন্দোলনকামী বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহ একতাবদ্ধ হয় এবং ছাত্র জনতা- শ্রমিক-পেশাজীবিসহ আপামর জনগন সরকার বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তুলে। জনতার দূর্বার আন্দোলনের মুখে সরকার পরিবর্তনকে গণঅভ্যুত্থান বলা হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অন্যায় অবিচার ও সমাজে যখন চরম আকার ধারন করে, সমাজে যখন পর্বত প্রমান বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণকে বঞ্চিত করে তখনই জনগণ ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহ করে। এটাই পৃথিবীর দেশে দেশে গণবিদ্রোহের ইতিহাস, শাসকেরা নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে একে দমনের চেষ্টা করে। তারা মরিয়া হয়ে উঠে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে কিন্তু নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে টিকে থাকা যায় না। শত নির্যাতন ও নিপীড়নকে উপেক্ষা করে জনগন এগিয়ে আসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে। বাংলাদেশ রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই সময়ে এটা প্রমানিত হয়েছে।

১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে যে লাগাতার আন্দোলন ২৭শে নভেম্বের -৪ঠা ডিসেম্বর পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার পট ভূমি রচিত হয়েছিল তিলতিল করে। এক ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের যে ধারা ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল, সারাদেশকে দূর্নীতি ও কতিপয় ব্যক্তির লুন্ঠনের এক অবারিত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, অত্যন্ত উলঙ্গভাবে রাজনীতি ও প্রশাসনের সামরিকীকরণ ঘটানোহচ্ছিল এবং সর্বোপরি গোটা দেশের বর্তমানই শুধু নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবাধ এক গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল- তাই একত্রে কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে তৈরী করছিল জনগনের এক সর্বব্যাপী উত্থানের পটভূমি। আর এই সকল বাস্তব কারণ সমাজে ও রাজনীতিতে উপস্থিত শক্তি গুলোকে বাধ্য করেছিল এই সর্বব্যাপ্ত জাগরনের জন্যে, জনগণের এই শক্তিকে ধারন করবার জন্যে অন্ততঃ যে শক্তিকে আপন আপন স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্যে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গণ-আন্দোলনের লক্ষ্য

গণ-আন্দোলনের প্রধান প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন। ২। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। ৩। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা। ৪। সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার পূর্ণ বিন্যাস করা।[২]

গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি

৯০ এর গণআন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে ছিল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এই বার সরকারের পরিবর্তন ঘটে শান্তিপূর্ণভাবে, অতীতে এমন হয় নাই, এইবার রাজনীতির বিজয় হয়েছে। আন্দোলন শেষে রাজনৈতিক জোটগুলি হইয়া উঠে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। এমনটি অতীতে ঘটে নাই। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে এইবার দলীয় জোটগুলির মধ্যে ছিল ঐক্যতা। অতীতে ইহার ও কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই গণ-আন্দোলনের রূপরেখা ছিল ভিন্ন। আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য হইতে শুরু করিয়া দলীয় পর্যায়ে পর্যন্ত পরিব্যপ্ত ছিল ঐক্যতা। এই আন্দোলনে যতটুকু ছিল প্রত্যাশা তাহার চেয়ে অনেক বেশী ছিল প্রত্যাখান। জেনারেল এরশাদকে প্রত্যাখান, তাঁর স্বৈর শাসনের প্রত্যাখান, সামাজিক দূর্নীতি ও মূল্যবোধের অবস্থা এবং তাঁর সহযোগীদের নিন্দনীয় ভূমিকারপ্রত্যাখানই ছিল এই আন্দোলনের মূল সুর।[৩]

গণ-আন্দোলেনের সূচনা হয় ঢাকায়, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত তা সীমিত থাকে ঢাকা এবং দেশের বড় বড় শহরে। আন্দোলনের গতি ও গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জেলা শহরে, উপজেলায় এমনকি ইউনিয়ন পর্যন্ত। প্রথমে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরবর্তীতে তা জনতার সম্পদে রূপায়িত হয়।

লাগাতার আন্দোলনের ঘটনা ক্রম ও গণ-অভ্যুত্থান

১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে পর্যায়ের সূচনা ২৭শে নভেম্বর এসে তা অভ্যুত্থানমুখী হয়ে ওঠে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর জেঃ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই ঘটনাবলী আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। স্বৈরাচারী এরশাদকে হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৮২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তা শেষাবধি গণঅভ্যুত্থান ৯০-এ রূপান্তরিত হয়।

১০ই অক্টোবর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯০। ৫৬টি দিন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল এই দিনগুলিতে ঢাকার রাজপথ ছিলো উত্তাল। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ কত দৃঢ় ও শক্ত হতে পারে এই ৫৬ দিনের ঘটনাপ্রবাহ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হত্যা, ষড়যন্ত্র কিছুই জনতার অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে রুখতে পারেনি। বরং তা দিনে দিনে হয়ে উঠেছে আরও শক্তিশালী ও বেগবান।

১) আলী রিয়াজ ও জিল্লুর রহমান সম্পাদিত, গণঅভ্যুত্থান, '৯০ রক্তেভেজা আঁধার আমার, কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৪২।

২) এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে সেই দিন গুলোর ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি দিনের ঘটনাই এগিয়ে নিয়ে গেছে জনতার আন্দোলনকে। এই উত্তাল দিনের ধারা ক্রমিক বর্ণনায় আগামী দিনের ইতিহাস রচনাকেই কেবল সাহায্য করবে তা নয়, উপরন্ত জনতার অপরিমেয় শক্তি উপলব্ধি করতে ও সাহায্য করবে।

১০ই অক্টোবর আন্দোলনের মাঠ পরিস্থিতি এক অভাবিত জন জোয়ার সৃষ্টি করে। সূচনাপর্বেই আন্দোলনের প্রকাশ জনতার তীব্রতা এক জঙ্গী ও উত্তাল আন্দোলনের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে। এইদিন ছিল ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোটে যুগপৎ আন্দোলনের অবরোধ কর্মসূচী এবং সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট। তিন জোটের কর্মসূচীকে অনুসরণ করে জামাত, ছয়দল, জাগপা, কমিউনিষ্ট লীগ, ঐক্য প্রক্রিয়া, মুসলিম লীগ এবং আরো কিছু দল ও জোট। আকস্মিকভাবে বিরোধী দলের আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রতিহত করার জন্য সরকার অতিরিক্ত কঠোরতা আরোপ করেন। পুলিশ এবং বিডিআর দিয়ে সচিবালয় এলাকার সঙ্গে সংযোগকারী সবকটি সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। হাইকোর্ট এলাকা থেকে কার্জন হল, তোপখানা, বিজয় নগর সড়কের মুখ। সিপিবি অফিসের সামনে থেকে দৈনিক বাংলার মোড়, জিপিও এবং স্টেডিয়াম এলাকা এবং রমনা মার্কেটের রাস্তায় পুলিশ ও বিডিআর সাধারণ মানুষের প্রবেশ বন্ধ করে রাখে। এর প্রতিক্রিয়া হয় প্রচন্ড। সরকারের এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা কার্যতঃ সরকারের দূর্বলতাকেই প্রতিফলিত করে। এতে জনগন প্রথম সুযোগেই সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। এই দিনের সমাবেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলের সমাবেশ হয় বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমাবেশ বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকে এবং ৫ দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জি পি ও -এর সামনে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলের সমাবেশ ছিলো শান্তিপূর্ণ। এ দিনের মূল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বি এন পির সমাবেশ স্থানে। এখানে সাড়ে ১১টায় এরশাদের একটি কুশ পুত্তলিকা দাহ করার মধ্য দিয়ে জনগন তাদের বিক্ষোভের সূচনা করে। এখানে অন্যান্য এলাকা থেকে ছাত্র জনতা এসে যোগ দিতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। জনতার চাপের মুখে পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে জয়ী ছাত্র জনতা মূল সমাবেশে যোগ দিয়ে আরো জঙ্গী হয়ে ওঠে। এ সময় বি এন পির নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে পুলিশকে ব্যারিকেড তুলে নেয়ার আহবান জানান। ১২-২০ মিনিটে পুলিশ হঠাৎ বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে বেগম খালেদা জিয়াসহ নেতৃবৃন্দ লাঠির আঘাতে মাটিতে পড়ে যান। এই ঘটনায় জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মুহূর্তে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসবাদীরা মতিঝিলের আল্লাহওয়ালা বিল্ডিং থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। গুলি বর্ষনে সিরাজগঞ্জের উল্লাহ পাড়া কলেজের ছাত্র নেতা জেহাদসহ পাঁচ ব্যক্তি নিহত হন। সেই সঙ্গে পুলিশ বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে। ঘটনাটি সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। পুলিশ, বিডিআর ও জাতীয় পার্টির সন্ত্রাস যতই তীব্র হয়ে ওঠে জনগনের বিক্ষোভ ততই হয়ে ওঠে প্রতিরোধ্য। ফলে গুলিস্তান, নবাবপুর, দিলকুশা সব জায়গাতেই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বেলা তিনটা পর্যন্ত পুরো এলাকায় টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ এবং ভাংচুরের ঘটনায় সারা রাজধানী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর আসে পুলিশের গুলিতে নিহতদের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন এলাকা থেকে জংগী মিছিল বের হয়। একটি মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয় আরও মিছিল। এই লাশ গুলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে সাড়ে তিনটায় বের করা হলে পুলিশ এবং জনতার মধ্যে লাশ নিয়ে টানা হেঁচড়ার এক পর্যায়ে ছাত্ররা জেহাদের লাশ ছিনিয়ে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে। হাজার হাজার ছাত্র তখন ক্যাম্পাসে সমবেত হয়। এই পরিস্থিতিতে সব ছাত্র সংগঠনগুলো মিলে মাত্র ৭ মিনিটের আলোচনায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করেন। ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের সমস্ত মত পার্থক্য আপাতত মুলতবি রেখে এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য এটি ছিল প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জেহাদের লাশকে সামনে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শপথ নেয় এরশাদের পতন না ঘটিয়ে তারা ঘরে ফিরবে না। এই শপথের দৃঢ়তায় ম্লান হয়ে যায় রাজনৈতিক ঐক্যের অসম্পূর্নতা।

১০ই অক্টোবর আন্দোলনের মাঠ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিন জোট নেতৃত্ব পর দিন সকাল সন্ধ্যা হরতালের সিদ্ধান্ত নেন। ১১ই অক্টোবর দেশব্যাপী পালিত হয় হরতাল। সারাদিন ব্যাপি বিক্ষুব্ধ মানুষ সরকারী শান্তিরক্ষী বাহিনী গুলোর সংগে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়। ১০ই অক্টোবর ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশ বর্বরোচিত হামলা চালায়, শাহবাগের মোড়ে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত ডাকসু ভিপি আমানুল্লাহ আমান, জি এস শায়কুল কবির খোকন, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতাও কর্মী। এ দিনের জনসভা শেষে বি এন পি নেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, সরকারী নিপীড়ন অতীতের সকল বর্বরতাকে ও ছাড়িয়ে গেছে। কোন কিছু জনগনের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনগন সরকারী অত্যাচারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। ৮ দলীয় সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলবে। ১১ই অক্টোবর ঘটনার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১৩ই অক্টোবর দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহবান করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তারা বলেন, প্রয়োজনে ২৭ ও ৩২ নম্বর ঘেরাও করে ঐক্যে বাধ্য করবো। ১৩ই অক্টোবর ছাত্র ধর্মঘট সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল সমর্থন করেন। ১৩ই অক্টোবর সারা ঢাকার রাজপথে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা পুলিশের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সম্মুখে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার ওপর পুলিশ গুলি বর্ষন করলে মনির ও রতন নামের দু'জন বিক্ষোভকারী নিহত হন। মুনিরুজ্জামানের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার পর পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আবার ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

এই দিন থেকে সরকার ও ঘটনা প্রবাহের উপর তার নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৩ই অক্টোবর গভীর রাতে সরকার ছাত্র আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে যায়।

১৪ই অক্টোবর অর্ধদিবস হরতালের মধ্যে এ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট: বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশকে অবৈধ বলে বর্ণনা করেন। এই দিন তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একের পর এক হরতাল না ডেকে নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্ররা এবার কেবল রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী অনুসরণ করেনি, নিজেরাও স্বতন্ত্র কর্মসূচী গ্রহন করে। রাজপথে ছাত্র জনতার সংগ্রামী উপস্থিতি এ সময় আন্দোলনের উত্তাপকে সার্বক্ষণিক ভাবে ধরে রাখে। এ দিনের বিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচীতে খালেদা জিয়া গ্রামে গঞ্জে মফস্বল মহল্লায় সরকার পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

১৫ই অক্টোবর ছাত্র ঐক্যের আহবানে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করা হয়। এরশাদের পতনের দাবীতে রাজপথ মুখরিত হয় জনতার শ্লোগানে। এ দিনের সমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন, আজ কোন শ্লোগান এক্য নয়, এই ঐক্য ছাত্র জনতার রক্তে গড়ে উঠেছে। ১৬ই অক্টোবর বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোর আহবানে সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়, রাজপথে ছাত্র জনতার

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলে উচ্চারিত হয় শ্লোগান ছাত্র সমাজ এক হয়েছে বিরোধী দল ও এক হও। তিন জোট ও তাদের অনুসারীদের জনসভা থেকে এ দিন ২৭ অক্টোবর রাজপথ, রেলপথ, অবরোধ। ১০ই নভেম্বর হরতালসহ ২৩ দিন ব্যাপী লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষনা করা হয়। ১৮ অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবীতে ছাত্র ঐক্য বিক্ষোভ পালন করে। ১৯ই অক্টোবর তিন জোট শোক মিছিল বের করে। ২১শে অক্টোবর তিনজোটের দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ পালিত হয়। ২২শে অক্টোবর ছাত্র ঐক্যের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে ছাত্র, অভিভাবকদের যৌথ সমাবেশ হয়। ২৩শে অক্টোবর বিরোধী দলের জেলা উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী এবং ২৫ অক্টোবব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র হরতাল পালিত হয়।

এভাবে একের পর এক কর্মসূচী গ্রহনের পর ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে ২৭শে অক্টোবর বিরোধী দলগুলো বড় ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করে। এই দিন তিন জোট আহুত রেলপথ, রাজপথ, অবরোধ কর্মসূচী সরকার বিরোধী আন্দোলনে সম্পূর্ণ নতুন একটি আবহ সৃষ্ট করে। বস্তুতঃ এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই প্রমানিত হয়ে যায় জনগণ এই সরকারের পরিবর্তন চায়। এই পরিস্থিতি এরশাদ ও তার নীতি নির্ধারকদের চিহ্নিত করে প্রবল ভাবে। ৮ দল ও ৫ দল সকাল ৮টা থেকে ২টা ও ৭ দল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অবরোধের কর্মসূচী ঘোষনা করলে ও এ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদেশ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দল ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা কর্মীরা সারা দিন ব্যাপী রাস্তায় অবস্থান নিয়ে মিটিং মিছিল করে। এ দিনের জনসভায় খালেদা জিয়া বলেন, দেশ চলছে জনগনের কথায়। সরকার পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এরপর ও যদি সরকার ক্ষমতা ছেড়ে না দেয় তা হলে এমন কর্মসূচী আসবে যে সরকার পালানোর পথ পাবেন না। শেখ হাসিনা বলেন, অবরোধ কর্মসূচী সরকারের কাঁপন ধরেছে। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এখন প্রয়োজন আর একটি মাত্র ধাক্কা। ৫দল বিরোধীদলগুলোকে ঐক্যে দৃঢ় থাকার আহবান জানায়।

আন্দোলনের তীব্রতা ছাত্রঐক্যের ক্রমোত্থান ও রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা সরকারকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ৩১ অক্টোবর সরকার পতনের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পটভূমি সৃষ্টি হয়। এ দিন থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেন, এ ক্ষেত্রে এরশাদ ভারতের বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মান সংক্রান্ত বিরোধকে ব্যবহার করেন। একটি পত্রিকায় বাবরী মসজিদ পুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে শীর্ষক একটি কাল্পনিক খবর পরিবেশন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে ৩০শে অক্টোবর চট্টগ্রাম ও ৩১শে অক্টোবর ঢাকার কয়েকটি মন্দির ও হিন্দু জনপদে হামলা চালানো হলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তিন জোট জামাতসহ প্রায় সকল বিরোধী জোট ও দল, সাংস্কৃতিক পেশাজীবি ও ছাত্র সংগঠন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মিছিল সমাবেশ করে। ৫ ও ৭ দল যৌথভাবে এবং ৮ দল একক ভাবে শান্তি মিছিল বের করে।

বস্তুতঃ আন্দোলনের এ পর্যায়ে ছাত্র ঐক্যের একের পর এক আন্দোলনমুখী কর্মসূচী পালন করে নেতৃত্বের নবধারা সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক জোটের ঐক্যের অসম্পূর্ণতার পাশাপাশি ছাত্র ঐক্যের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার বিকল্প নেতৃত্ব তৈরী হয়। অবস্থার যে জায়গাটি তৈরী হয় যার পেছনে সরকারের দুঃশাসনে অতিষ্টিত মানুষ আন্দোলনে একাত্ম হবার সুযোগ পায়। ১লা নভেম্বর এরশাদ সরকার ঢাকা শহরে কার্ফ্যু জারি করেন। আল্লাওয়ালা ভবনে মহানগরী জাতীয় পার্টি অফিসের সামনে এক সমাবেশে এরশাদ কার্ফ্যু বলবৎ ও সেনাতলবের ঘোষনা দেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো তাৎক্ষনিক ভাবেই এরশাদ সরকারের অভিলাষ ধরে ফেলেন। দুপুর আড়াইটায় ৮ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, বাবরী মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলমান আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করছে। ৩রা নভেম্বর বিরোধী দল গুলো কার্ফু এবং ১৪৪ ধারাকে আন্দোলন নস্যাৎ এর চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪৪ ধারা ভংগ করে মিছিলের ঘোষনা দেয়। ৪ঠা নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এক বিরাট মিছিল বের করে। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষেও ১৪৪ ধারা জারি করে রাখা সম্ভব ছিলনা, ফলে ৪ঠা নভেম্বর সরকার ১৪৪ ধারা তুলে নেয়। ৫ই নভেম্বর বিরোধী দল গুলো তাদের পূর্বঘোষিত রেডিও ও টেলিভিশন ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ৬ই নভেম্বর ৮ দল পান্থপথে এবং ৭ ও ৫ দলীয় জোট বাংলা মোটর এলাকায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ করে। শেখ হাসিনা এ দিন অনেকটা আকস্মিক ভাবেই সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিক নির্দেশনা ঘোষনা করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের ৫১ ধারা অনুযায়ী প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন। তার জায়গায় তিন জোটের মনোনীত একজনকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং ৫৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ঐ নিরপেক্ষ উপরাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

১০ই নভেম্বর বিরোধী দল গুলোর আহবানে পালিত হয় চলতি আন্দোলনের সবচেয়ে সফল হরতাল কর্মসূচী। এ দিনই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। প্রতীকী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচীর সাফল্যে সরকারের অস্তিত্বই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে ক্রমশ।

১৪ নভেম্বর আদমজীতে সরকারী শ্রমিক লীগের সংগে বিরোধী সংগঠন গুলোর সংঘর্ষে ১২ জন শ্রমিক নিহত হয়। ৩ জোটের সংগে সকল ছাত্রঐক্য নেতাদের বৈঠকে সকল ফোরামের আন্দোলন সংহত করার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। শ্রমিক সংগঠন ও ছাত্রসংগঠন গুলো আন্দোলনে আন্তরিকতার ঐক্য সুপ্রমান করার জন্য রাজনৈতিক দল গুলোকে অবিলম্বে এককেন্দ্রীক আন্দোলন শুরু করার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রদানের দাবি জানায়।

১৭ই নভেম্বর বিরোধী আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরণ ঘটে ছাত্রঐক্যের মন্ত্রী পাড়া ঘেরাও কর্মসূচীতে। মাঠ পরিস্থিতির আকাঙ্খার সংগে সমান্তরাল এই কর্মসূচী ছিল সরকারকে সরাসরি প্রতিরোধ লক্ষ্যমুখী। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল এ দিন পরিনত হয় রাজনৈতিক যুদ্ধ মাঠে। মন্ত্রী পাড়ার আশে পাশে ৮টি সমাবেশের আয়োজন করে সরকার ও সরকারী দল তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে। সারা দেশের সরকার নির্ভর প্রতিষ্ঠান গুলোর ব্যক্তিবর্গকে সমাবেশে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়। বিপুল অর্থের বিনিময়ে ভাড়ায় কর্মী সংগ্রহ করা হয়। ছাত্র জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে গুড়িয়ে যায় সরকারের এ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, মন্ত্রী পাড়াকে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ছাত্র জনতার রুদ্ররোষে সরকারী দলের তিনটি সমাবেশ মঞ্চ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। অন্যান্য মঞ্চ থেকে তড়িঘড়ি সরকারী সমাবেশ সমাপ্ত করা হয়। রাজপথে সুস্পষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় আন্দোলনকারী শক্তির। সরকারী সন্ত্রাসীচক্র ও পুলিশের নিপীড়নের জবাবে ছাত্র ঐক্যের নেতারা জানিয়ে দেন লাঠি,গুলি,টিয়ারগ্যাস কিছুই আন্দোলনকে বানচাল করতে পারবে না।

১৮ নভেম্বর খালেদা জিয়া আন্দোলন পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে ঘোষনা করেন, সরকারের পতন ঘটিয়ে ছাত্র জনতা সকল সন্ত্রাসের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তাদের উৎখাত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষণা এবং এর সাফল্য

১৯শে নভেম্বর ৯০ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন । ঐ দিন স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিনতির দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনরত তিন জোট সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিদলীয় নিরপেক্ষ ও একটি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ৭,৮ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট চলমান আন্দোলনের একটি তাৎপর্য ও গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়ে পূর্ণগণতন্ত্রে উত্তরনের উপায় নির্দেশ করে একটি ঐতিহাসিক যুক্ত ঘোষণা দেয় । এটি যৌথ ঘোষণা, যুক্তঘোষণা, অভিন্ন ঘোষণা,তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা, তিন জোটের রূপরেখা ইত্যাদি যে নামেই ডাকা হোক না কেন ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে প্রদত্ত আন্দোলনরত রাজনৈতিক জোট তিনটির এই যৌথ ঘোষণাই ১৯৮২ থেকে ৯০ এই ৮ বছরে রাজনৈতিক শিবিরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জেঃ এরশাদের সামরিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে সেটার পতন ঘটানোর ব্যাপারে তাদের দিক থেকে সবচেয়ে পরিকল্পিত,অগ্রসর ও সাহসী কর্মসূচী ও পদক্ষেপ ।

১০ই অক্টোবর ১৯৯০ থেকে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলন মোমেনটাম বা গতি লাভ করে এবং এক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। এ সময় এ যাবৎকার গণ দাবীর চাপ, ছাত্র,শিক্ষক বুদ্ধিজীবি পেশাজীবি এবং সাধারণ ভাবে শ্রমজীবি মানুষের প্রচন্ড তোড়ে আন্দোলনরত রাজনৈতিক জোট গুলো দীর্ঘ আলাপ আলোচনা,তর্ক বিতর্ক, সংশোধন সংযোজনের পর ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে তিনটি স্বতন্ত্র মঞ্চ থেকে অভিন্ন যৌথ ঘোষনা প্রকাশ করে ।

৭ দলীয় জোটের উদ্যোগে ফুলবাড়ীয়া বাসস্ট্যান্ডে জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় ৭ দলীয় জোটের পক্ষে যুক্ত ঘোষনাটি পাঠ করেন বি এন পি নেতা কর্ণেল অবঃ অলি আহমদ । সভাপতির ভাষনে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার সংবিধান লংঘন করে গায়ের জোরে ক্ষমতায় বসে এখন আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সংবিধানের জন্য মায়াকান্না করলেও জনগণ তাতে বিভ্রান্ত হবেনা। সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হলে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে ।

শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে এক বিশাল জনসভায় ৮ দলীয় জোটের পক্ষে যুক্ত ঘোষনাটি পাঠ করেন ন্যাপ নেতা কামাল হায়দার ।

টিপু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে জাসদ বাসদ কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত জনসভায় ৫ দলীয় জোটের পক্ষে যুক্ত ঘোষণাটি পাঠ করেন জাসদ ইনু নেতা নূরুল আম্বিয়া । স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে খ্যাত তিন জোটের রূপরেখা নিম্নে পত্রস্থ করা হল ঃ

১। হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পুর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ।

Dhaka University Institutional Repository

ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের ক ১ ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণ যোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন ।

খ) এই পদ্ধতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ।

২। (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি,উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবেন না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না ।

(খ) অন্তবর্তীকালীন এই সরকার শুধু মাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুর্নগঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুন বিন্যাস করবেন ।

(গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই আস্থা পুনঃ স্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে ।

(ঘ) গণ প্রচার মাধ্যমকে পরিপুর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি সকল রাজনৈতিক দলকে প্রচার-প্রচারনার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে ।

৩। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

৪। (ক) জনগনের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক বা সংবিধান বর্হিভূত কোন পন্থায় কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না ।

(খ) জনগনের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে ।

(গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।[৩]

জামায়াতে ইসলামী,৭ দলীয় সংগ্রামী জোট, জনতাদলসহ আন্দোলনরত অপরাপর দল সমূহ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুরূপ রূপরেখা ঘোষনা করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো তাদের লক্ষ্যকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়।

৩) হাসান [illegible], আমাদের ভবিষ্যৎ ও করণীয় নব্বই এর ঐক্য জোটের আলোকে, [illegible], ঢাকা, ১৯৯১ পৃ ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিন জোট কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণার পাশাপাশি ঐক্যকে আরো দৃঢ় করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ জন শিক্ষক এ দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে দুই নেত্রীকে এক মঞ্চে আসার আহবান জানান । জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী তিন জোটের রূপরেখা ঘোষনা আন্দোলনের গুনগত উত্তরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবি, সাংস্কৃতিক ফোরামসহ জনতার তীব্র শানিত আন্দোলনের আঘাত কেন্দ্রীভূত হয় একটি লক্ষ্যে তা হল স্বৈরাচারের পতন ।

এরশাদ সরকার এবং তার মন্ত্রীদের শত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯শে নভেম্বরের ঐ কর্মসূচী, ঐ অভিন্ন ঘোষণা সারা দেশের এবং বিশেষ করে শহর কেন্দ্রের ছাত্র শিক্ষক-চাকুরীজীবি-বুদ্ধিজীবি-পেশাজীবিদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় । অত্যন্ত উৎসাহ-আবেগের সংগে, নব প্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে, আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনায় আস্থাশীল হয়ে জনগন আন্দোলনরত জোট সমূহের পেছনে এবং সাধারণ ভাবে মবিলাইজড বা সমাবেশকৃত হয় । শুধু সমাবেশের ব্যাপারেই নয় জনগন অতি দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠে, প্রতিটি বিক্ষোভে-প্রতিবাদে এবং তীব্র থেকে তীব্রতর মাত্রায় অংশী হয়ে ওঠে। বরাবরের মতো অনেক প্রকাশ্য গোপন অপচেষ্টা চালিয়েও এরশাদ ও তাঁর সরকার ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ এর যৌথ ঘোষনার প্রেক্ষাপটে নবসৃষ্ট বেগবান আন্দোলন সংগ্রামকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় ।

১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনার মধ্যে সে পর্যায়ে এ দেশের প্রতারিত ও বঞ্চিত অথচ সংগ্রামী গনমানুষ, শহর কেন্দ্রের লড়াকু গোষ্টীগুলো খুঁজে পায় তাদের ৯ বছর ধরে লালিত স্বপ্ন ও আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ । এ কারনে পূর্বেকার কোন কর্মসূচীর সংগে নয়, বরং ১৯শে নভেম্বরের তিন জোটের ঐক্য ঘোষনার সংগে জনগন নিজেদের একাত্মতা লক্ষ্যকরে অনুভব করে পেয়ে যায় যেন তাদের পথের দিশা, সংগ্রামের আবশ্যকীয় কর্মসূচী। সেই জন্যেই ১৯শে নভেম্বরের ঘোষনা প্রদানের পর থেকেই জনতা এবং তাদের অগ্রসর অংশ এক মুহূর্তের জন্যেও পিছিয়ে থাকেনি ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনা আন্দোলনরত জোটএয়ের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে, তবুও সেটা দেয়া হয়েছে জন দাবীর চাপের মুখে । এটি ঐতিহাসিক সত্য। তা ছাড়া এই ঘোষনার দ্বারাই জনগন সর্বাধিক উদ্বেলিত হয়েছিলো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো । ৮২-৯০ পর্যন্ত সামরিক জান্তার স্বৈর শাসনের পতন ঘটেছে এই ১৯শে নভেম্বরের ঘোষণার ভিত্তিতে জনগনের মরণপন গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে । জনগন সে পর্যায়ে ঐ ঘোষনার মধ্যে নিজেদের দাবী ও আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখেছিলো বলেই কেবল তার সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কাজেই ১৯শে নভেম্বরের যৌথ বা ঐক্য ঘোষনা রাজনৈতিক জোটত্রয়ের কর্মসূচী হলেও তাতে জন চেতনার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে এবং এই কর্মসুচী তাই অধিকারহীন এ দেশের সংগ্রামী জনতার সংগে অধিকার আদায়ের হাতিয়ার ও দিক নির্দেশনায় পরিনত হয়েছে। ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনা তাই বাংলাদেশের জনগনের ম্যাগনাকার্টা ।

এটি শুধু ১৯৯০ এর পর্যায়ে নয়, বরং ভবিষ্যতে ও যে জনগনকে অনেকখানি পথনির্দেশনা দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯শে নভেম্ববরের যৌথ ঘোষণা একটি ছোট দলিল; কিন্তু তাৎপর্যের দিক দিয়ে এটা অনেক বড় কাজ করেছে। এর নিকটকালীন ও তাৎক্ষনিক প্রভাব আমরা দেখেছি এবং আমাদের সচেতনতা ও আন্তরিক কর্মপ্রয়াস যদি থাকে তবে এর দূরপ্রসারী গভীর তাৎপর্য আমরা দেখতে পাবো।

Dhaka University Institutional Repository

গণঅভ্যুত্থান '৯০ ও এরশাদ সরকারের পতন

জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক স্বৈরসরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে তিন জোটের পক্ষ থেকে যে যৌথ ঘোষনা দেয়া হয়েছিলো তার ভিত্তিতে স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ভেতর অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় । এরশাদ এবং তার শাসন জনগনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ পথ পাওয়া যাচ্ছিল না, দিক নির্দেশনা ছিলনা । অত্যাচার, অনাচারে জনগণ গুমড়ে মরছিল । ঠিক এ রকম একটা সময়েই ব্যাপক জন দাবীর চাপের মুখে রচিত ও ঘোষিত হয় ১৯শে নভেম্বরের তিন জোটের যৌথ ঘোষনা। এই ঘোষনার মধ্যে অন্যান্য দাবী সহ জেঃ এরশাদের পতন এবং ৯ বছরের স্বৈরাচারের অবসানের লক্ষ্যে যে আশু দাবী, পথ নির্দেশ, লক্ষ্য ও ঘোষণা এবং সংগ্রামের কর্মসূচী ছিল, সেটাই ব্যাপক জনগণকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ মানুষকে জাগিয়ে তোলে । উদ্বেলিত করে। প্রচন্ড উৎসাহে, অমিততেজে, জীবন বাজি রেখে শত শহীদের সাথীরা, নূর হোসেন, শামসুল আলম মিলনের সহযোদ্ধা জনগণ এবং নাম না জানা শহীদদের সমব্যথী অগণিত মানুষ অভূতপূর্ব টর্নেডোর বেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে এবং সৃষ্টি করে মহান গণঅভ্যুত্থান । ২৭শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯০ এই ৮ দিন ধরে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করে । এই ঘোষনা প্রদানের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় নয় বছর ধরে দোর্দন্ড প্রতাপে সামরিক স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাওয়া জেঃ এরশাদ জনগনের ইচ্ছা ও রায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে, আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় । তিন জোটের মতালিটি অনুযায়ী এরশাদ পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে দেয় এবং ৬ই ডিসেম্বর ক্ষমতা ত্যাগ করে ।

২৭শে নভেম্বর ৯০ সারা দেশ বিশেষ করে ঢাকা শহরের অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌছে। এ দিন সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। ছাত্রদের মাঝে প্রতিরোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। এ দিন সকাল ১০টার দিকে শাহবাগ এলাকা দিয়ে ও পরে দোয়েল চত্বরের দিক দিয়ে সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। মধুর কেন্টিন থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি মিছিল টি এস সি হয়ে দোয়েল চত্বর অভিমুখে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা দোয়েল চত্বরের দিক থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণ করে এগুতে চেষ্টা করে কিন্তু ছাত্রদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তারা। সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রতিরোধে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা এ দিন লাঠি-মিছিলের কর্মসূচী নেয়। বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে একটি ছাত্র মিছিল রোকেয়া হলের সামনে পৌছামাত্র সরকারী মদদপুষ্ট বাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে। এ সময় উভয় পক্ষে ব্যাপক গুলি বিনিময়কালে একটি রিক্সায় চড়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডঃ মোস্তফা জালাল মহীউদ্দিন ও যুগ্ম সম্পাদক ডঃ শামসুল আলম মিলন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পিজি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন বি এম এ এর বিশেষ সভায় যোগ দিতে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর নিকট পৌছার পর পরই অর্তকিতে একটি গুলি ডঃ মিলনের বুকে বিদ্ধ হয় এবং অল্প পরেই তিনি মারা যান। প্রায় দেড় ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর ছাত্র ঐক্যের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা সাড়ে ১২ টায় চাঁনখার পুলের দিকে পালিয়ে যায়।

ডঃ মিলনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমস্ত শহর উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। সকল পেশাজীবিদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ডঃ মিলনের মৃত্যু স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয় এবং এই আন্দোলন প্রবল গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের মৃত্যু যেমন গণঅভ্যুত্থানের একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছিল। তেমনি ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে মিলনের মৃত্যু ও একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে কাজ করে। ডঃ মিলনের মৃত্যু ছাত্র-জনতা-শ্রমিক পেশাজীবি সকলকে আন্দোলনের অংশীদারে পরিণত করে।

Dhaka University Institutional Repository

তীব্র গনআন্দোলনের মুখে রাতে এরশাদ সরকার সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করে। সকল সংবাদ পত্রের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয় এবং বিদেশে সংবাদ প্রেরনের উপর ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এমন কি ডাক, তার, ফ্যাক্স, ফোন ইত্যাদি ব্যবহারের উপর ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সারা দেশ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

২৮শে নভেম্বর ছিল জনতা কর্তৃক ক্ষমতার শেষ খুটিটি উপড়ে ফেলার দিন। এ দিন সকাল থেকেই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, সংস্কৃতিকর্মীরা এরশাদের জরুরী অবস্থার যাবতীয় ঘোষনা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ও মিছিল করার জন্য বিক্ষোভকারীরা সমবেত হতে শুরু করে। মিছিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শত শত ছাত্রীর লাঠি হাতে নিয়ে মিছিলে অংশ গ্রহণ। ২৭ ও ২৮ নভেম্বর আন্দোলনের পুরো রূপটাই বদলে যায়, যা ছিল এতদিন গণআন্দোলন তা পরিণত হয় অভ্যূত্থানে।

২৭শে নভেম্বর সংবাদপত্রে সেন্সরশীপ আরোপের প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ২৮ তারিখ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ রাখে এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে সংবাদপত্র সেবীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

২৯শে নভেম্বর ছাত্র শিক্ষকদের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়াসহ সমস্ত শিক্ষক পদত্যাগ করেন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য তাদের মিছিল ও কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। সাংবাদিকদের ধর্মঘটের পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশনের শিল্পীরাও স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রিত প্রচার যন্ত্রের অনুষ্ঠান বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই রেডিও টেলিভিশনের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে।

আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বাহিনী রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালায়। এই দিন সান্ধ্যআইন পুনরায় বলবৎ হবার পর পরই ছাত্রদের একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে যেয়ে সভা করে। পুলিশ ছাত্রদের অন্য একটি মিছিলকে হাইকোর্ট মাজারের গেটে আটকে দিলে মিছিলকারীরা সেখানে বসে পড়ে। পুলিশ মিছিলকারীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে কিন্তু মতিঝিল এলাকার দিকে আসতে দেয়নি। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষে অন্ততঃ ৫ জন নিহত হয়। জরুরী অবস্থা জারির সংগে সংগে বিদেশে সংবাদ প্রেরণের উপর কড়া ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। বি বি সি থেকে বলা হয় আন্তর্জাতিক টেলিফোন অপারেটররা জানিয়ে দেন বাংলাদেশের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ খারাপ হয়ে গেছে। এ দিন থেকেই ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া অব আমেরিকা থেকে বেগম খালেদা জিয়া ও ডঃ কামাল হোসেনের ভাষন প্রচার করা হয়।

৩০শে নভেম্বর ভোর থেকেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক গণউত্তেজনা। প্রতিটি অলি, গলি থেকে মিছিল এসে মিলিত হয় প্রধান সড়কে। প্রতিটি মিছিলের গতিবেগ ছিল পাহাড় থেকে নেমে আসা বেগবান নদীর মত। মিছিলগুলো বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়। বায়তুল মোকাররম স্টেডিয়াম সংলগ্ন গেটে সমবেত হয়েছিল এগার লরী সৈন্য এবং উত্তর গেটে অবস্থান নিয়েছিল পুলিশ। সৈন্য ও পুলিশের প্রাচীর ভেদ করে জনতার সমুদ্র লক্ষ্যস্থলে মিলিত হয়। জুমার নামাজের পর গায়েবানা জানাজার পর বিরোধী দলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এই দিনই প্রেসক্লাবের সামনে মহিলা পরিষদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মৌণ মিছিলটি নীরব প্রতিবাদের একটি অবার্থ ঐক্যের প্রতীক, তাদের উপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। এই খবর ঢাকা শহরে দ্রুত অগ্নিস্ফুলিংগের মত ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বের হয়। গভীর রাত পর্যন্ত মিছিল অব্যাহত থাকে।

১লা ডিসেম্বর তা চূড়ান্ত বিস্ফোরণে রূপ নেয়। এই দিনই ঘোষণা করা হয় ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের যৌথ আহবান ও নির্দেশাবলী। ঘোষণায় বলা হয়ঃ -

১। গণবিরোধী খুনী এরশাদ সরকারের তথাকথিত জরুরী আইন, কারফিউ, ১৪৪ ধারা প্রভৃতি উপেক্ষা করে দেশের সর্বত্র শহরে, বন্দরে, হাটে-বাজারে, পাড়ায়-মহল্লায়, রাজপথে লাখো মানুষের সমাবেশ ও মিছিল অব্যাহত রাখুন। প্রতিদিন সর্বত্র জংগী মিছিল সংগঠিত করুণ এবং গণআন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুণ।

২। স্বৈরাচারী সরকারের সকল কাজকর্ম অচল করার লক্ষ্যে সব সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অফিস এবং সকল আদালতে যাবতীয় কাজকর্ম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখুন।

৩। অবৈধ খুনী এরশাদ সরকারের সাথে সকল উপায়ে পূর্ণ অসহযোগিতা শুরু করুন।

৪। দেশের সর্বত্র বাস, ট্রাক, লরি, রেল, লঞ্চ, ফেরী বিমান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখুন।

৫। ২রা ডিসেম্বর বাদজোহর ১লা ডিসেম্বরের শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজা এবং মসজিদ, মন্দির, গীর্জা সহ সকল উপাসনালয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত করুন।

৬। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক লাগাতার হরতাল অব্যাহতভাবে পালন করুন।

৭। ৪ঠা ডিসেম্বর দেশের সর্বত্র সভা, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতি সংগঠিত করার মাধ্যমে স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস সফল করুন।

৮। ৫ই ডিসেম্বর প্রতিটি উপজেলায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের আহুত বিক্ষোভ দিবস সফল করুন। প্রতিটি উপজেলায় ও ইউনিয়নে জংগী বিক্ষোভ সংগঠিত করুন এবং গনআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিন।

৯। দেশের সর্বত্র সকল মিল, কারখানা ও শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে তুলুন এবং এ সব অঞ্চলে ও প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ও বিক্ষোভ সংগঠিত করুন।

১০। ১০,১১,১২ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ সফল করুন।

১১। বীর ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, নারী সমাজ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবি, প্রকৌশলী, সংস্কৃতিসেবী, টিভি ও বেতারের শিল্পী ও কলাকুশলী এবং অন্যান্য পেশাজীবি মানুষের গৃহীত সকল আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করুন।

১২। চলমান গনআন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে অগ্রসর করার লক্ষ্যে অবিলম্বে জেলায়, উপজেলায়, ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ডে "গন সংগ্রাম কমিটি" গঠন করুন এবং স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত করুন।[৪]

এই নির্দেশ অনুসারে সকল কর্মসূচী চালিত হতে থাকে। ১লা ডিসেম্বর হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এ দিন ঢাকা নগরে জনতা ও বিডিআর-এর সংগে সবচেয়ে বড় ধরণের সংঘর্ষ হয় মীরপুরে।

৪। রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব, বীর বুক মার্ট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৫৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে বিডিআর-এর গুলি বর্ষণে ঘটনাস্থলেই ৫ জন নিহত হয় । পুলিশ - বিডিআর মিরপুরে বাড়িতে বাড়িতে হানা দেয় এবং নিরীহ জন সাধারণের ওপর নির্যাতন চালায় । পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষে অন্ততঃ ১০ জন নিহত হয় ।

২রা ডিসেম্বর গনবিক্ষোভের বিস্তার ও তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় । রামপুরা এলাকায় এবং মালিবাগ রেলক্রসিং এর কাছে জনতা কয়েক দফা পুলিশ ও বিডিআর-এর লরীর উপর হামলা চালায় । ঐ দিন প্রেসক্লাবের সামনে জনতার সমুদ্র আরো বিশাল আকার ধারণ করে। এই দিন আইনজীবিরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে আদালত বর্জনের কথা ঘোষণা করেণ এবং আদালত বর্জনের জন্যে বিচারপতিদের ও আহবান জানান । ঐ দিন ছাত্ররা ভ্রাম্যমান গণ আদালতে এরশাদের বিচার করে কুশপুত্তলিকা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি কার্যকর এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করে ।

সারা ঢাকাশহরে গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন, কামরুল হাসান অংকিত বিশ্ব বেহায়া স্কেচ সহ কবিতা ও প্রচার পত্র ছাড়া হয় । ১৫,৭ ও ৫ দলীয় জোট সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন- হরতাল অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । দেশের সকল শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয় ।

৩রা ডিসেম্বর সকালে মতিঝিল সেনাকল্যান সংস্থার ভবনে বোমা নিক্ষেপ করা হয় । ঢাকার বিভিন্ন দপ্তরে লাগাতার হরতালের সমর্থনে ছাত্র যুবকরা ব্যাপক জনসংযোগ অভিযান পরিচালনা করে এবং অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। সরকারী অফিসাররা আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষনা করেন এবং বিসি এস কমকর্তারা পদত্যাগ করে মিছিলে অংশ নেয় ।

চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভাংচুর করা হয় এবং তাকে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়। সাবেকমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর বাসভবনে জনতা হামলা চালায় এবং ফায়ার সার্ভিসে অগ্নিসংযোগ করে। দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি একেবারে ভেংগে পড়ে। ঢাকায় গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন ২ প্রকাশ করা হয়।

দেশের এই বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতিতে জেঃ এরশাদ ৩রা ডিসেম্বর রাতে বেতার টিভিতে এক ভাষণে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে সমঝোতামূলক প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে নির্বাচনের ১৫ দিন আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। এই ঘোষণার সাথে সাথেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র জনতা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এরশাদের পদত্যাগ একদফা দাবী নিয়ে রাজপথে নেমে আসে।

৪ ডিসেম্বর সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরশাদের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার। লাখো মানুষের ঢল নামে। অফিস আদালত জনশূন্য হয়ে পড়ে। 'এক দফা এক দাবী এরশাদ তুই এখন যাবি' শ্লোগানে ছাত্র-জনতা রাজপথে ফেটে পড়ে। দুপুরের পর ঢাকাশহরের মিছিলগুলো সমবেত হয় প্রেসক্লাবের সড়কের সামনে। সকল শ্রেণীর লোক সমবেত হয় জন সমুদ্রের সংগে। সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই হয় না। তখন পুলিশ ছাত্রঐক্যের নেতাদের বক্তৃতা শোনেন। কারো কারো মুখে ছিল ক্লান্তিশেষের হাসি। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া তাদের ভাষণে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মহান শহীদদের আত্মত্যাগ ও সকল শ্রেণীর মানুষ গণঅভ্যুত্থান সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। তারা সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে এভাবে নেমে আসে বাংলাদেশের রাজনীতি। জনসমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যায় "স্বৈরাচারের বলদর্পি আহবান। ভেসে আসে জেঃ এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা। গণঅভ্যুত্থানের রায়ের নিকট নতিস্বীকার করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৪ঠা ডিসেম্বর রাতেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন। রাত ১০ টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংরেজী সংবাদে জানিয়ে দেয়া হয় এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিরোধী দলগুলোর নিকট নিরপেক্ষ উপরাষ্ট্রপতির নাম আহবান করা হচ্ছে। বিজয়ের মহাকাব্যের সূচনা পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষের ঢল নিমিষেই রূপান্তরিত হয় আনন্দ উচ্ছ্বাসমুখর বিজয় মিছিলে --- গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ী বর্নচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয় সারা বাংলাদেশ।

৫ ডিসেম্বর ভোর হতেই দলীয় জোটনেত্রী খালেদা জিয়া এবং ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত টেলিভিশন ভাষণে জনগনকে ধৈর্য ধরতে ও সংযমশীল হতে অনুরোধ জানান।

এ দিন সকাল থেকেই সারা দেশে শুরু হয় বিজয় উৎসব। রাজধানী ঢাকা আক্ষরিক অর্থেই পরিনত হয় উৎসবের নগরীতে। উৎফুল্ল ছাত্র জনতা রাজধানীর অলি-গলি, পাড়া-মহল্লা থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে আসতে থাকে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে। জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু করে পল্টন মোড়-নূরহোসেন চত্বর, বায়তুল মোকাররম ও গুলিস্তান চত্বর ছিল ছাত্র জনতার মহামিলন কেন্দ্র। বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত জনতা একে অপরের সাথে করমর্দন, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সকাল ১০টায় পল্টন মোড়ে নির্মিত জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে সারাদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং ছাত্র নেত্রীবৃন্দসহ পেশাজীবি সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ মঞ্চ থেকে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে ডাকসু জি এস খায়রুল কবীর খোকন একটি ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। ঘোষণা পত্রে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও দুর্নীতির অভিযোগে অবিলম্বে এরশাদকে গ্রেফতার এবং বিচারসহ ১৩ দফা দাবী বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়।

ঘোষিত দাবী সমূহ হচ্ছে ঃ-

১। আজ থেকে সকল বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া। ২। গত নয় বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নিহতদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান এবং ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে শহীদ পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দানের ঘোষণা। ৩। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকল ছাত্র ও যুববন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, দন্ডাদেশ বাতিল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার। ৩। দূর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপিদের অবৈধ সম্পত্তি রাজেয়াপ্ত এরশাদ সরকারের সকল মন্ত্রীকে গণ দুশমন ঘোষণা ও তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধকরণ। ৫। এরশাদের নামে নামাংকিত সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার। ৬। মতিঝিল আল্লাওয়ালা ভবনকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতির যাদুঘর ঘোষণা।

সন্ধ্যা ৭টায় তিনজোটের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি হিসাবে মনোনীত হন। প্রধান বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমদ দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে শর্তসাপেক্ষে তিনজোটের অনুরোধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দেশের দায়িত্বভার নিতে সম্মত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৬ই ডিসেম্বর ৯০ তিনজোটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ দিন সকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয়সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং নির্বাচনকমিশনকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এ দিন দুপুর ১.৫৫ টায় বিমর্ষ-বিধ্বস্ত রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে আসেন এবং তার অব্যবহিত পরে বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে আসেন। এরশাদ বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আধঘন্টা কথা বলেন। এরপর উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন দুপুর ২.৪০ টায়। ১৫ মিনিট স্থায়ী এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাঁর পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, কেবিনেট সচিব এম কে আনোয়ার, রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এ এফ এইচ সাদিক, সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ নূরউদ্দিন খান, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মমতাজউদ্দিন আহমদ ও নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আলী মুত্তফা। পদত্যাগ করার পর পরই এরশাদ ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবউদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানান। তিনবাহিনীর প্রধানগণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানান এবং তার সাথে করমর্দন করেন। এর পর তিনি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তিননেতার মাজারে সুরা ফাতেহা পাঠ করেন।

পদত্যাগকারী স্বৈরশাসক এরশাদ তিনবাহিনীর প্রধান, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে শেষবারের মত করমর্দন করে পরাজিত, বিতাড়িত ও ধিক্কৃত ব্যক্তি হিসেবে বিদায়বেদনে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ষমতারমসনদ ছেড়ে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষসহ বিশ্বের উৎসুক মানুষ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের এ দৃশ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিনে উপভোগ করেন। আর এরই মধ্য দিয়ে সাঙ্গ হলো ব্যক্তিকেন্দ্রীক দুঃশাসনের ২৫৬ দিন। জনতার শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে বিদায় নিলেন ইতিহাসের স্বৈরশাসক। জগদ্দল একটি পাথর নেমে গেল বাংলাদেশের বুকের উপর থেকে।

এভাবে এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। জয় হয় রাজনীতি, দেশের রাজনৈতিক শক্তির। স্বৈরশাসনে বিধ্বস্ত ছাত্রদের ভাবমূর্তি হয় উজ্জ্বল। সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের গণে যোগ্য। গণতন্ত্রের হয় শুভসূচনা।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ট অধ্যায়

উপসংহার

বিশ্বের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যুগে যুগে কালে কালে আকাশচুম্বী ক্ষমতার মোহে স্বীয়স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বার বার স্বৈরশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে । এই সব একনায়কগন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিরস্ত্র নিরীহ জনতাকে করেছে পাইকারী হারে হত্যা, করেছে অবাধ লুণ্ঠন, চালিয়েছে নির্যাতনের স্টীমরোলার। ধরাকে সরাজ্ঞান করে এহেন অপকর্ম নেই যা তারা করেনি। আপাতঃ সাফল্য লাভ করলেও এদের কারোরই শেষরক্ষা হয়নি। ইতিহাস এই সাক্ষাই দেয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এক নায়কতন্ত্রের শেষ পরিনতি যা হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও তাই ঘটলো ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে। ক্ষমতার আসন থেকে বিদায় নিতে হল সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারকে। শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচার পুরোপুরি ভাবে পরাস্ত হল। মাথা নত করে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হলো এরশাদ সরকারকে। অভূতপূর্ব জনজাগরণ ও গনআন্দোলনের মুখে এই ছিলো তার অনিবার্য পরিনতি। যারা জনগণের শক্তিকে উপেক্ষা করে নিপীড়ন আর নির্যাতনের পথে ক্ষমতা আকঁড়ে থাকতে চায় তাদের শেষপরিনতি এই হয়। ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পৃথিবীতে কোন স্বৈরশাসকই শেষ পর্যন্ত রুদ্ররোষের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পায়নি স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ও। যে আসন পাকাপোক্ত করতে তাকে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও কুট কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে অবশেষে তার সেই ক্ষমতার দুর্গই বালির বাধের মতই মুহূর্তেই ধসে গেছে। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলাদেশের বীর ছাত্র জনতা ৮২ থেকে ধাপে ধাপে যে গণআন্দোলন গড়ে তোলে ৯০ এর উপান্তে এসে তা উপনীত হয় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসন নানা কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আলোচিত হবে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে হটিয়ে এই স্বৈরশাসনের উত্থান ঘটেছিল। ফলে বিলুপ্ত হয়েছে বহু সংখ্যক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ৮২ এর সামরিক শাসন বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আসে এক অভিশাপের মতো। আসলে সামরিক অভ্যুত্থান কোন সময় শুভ ফল আনয়ন করে না। সামরিক শাসন যে কোন সমাজের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিকৃত করে। দলীয় ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে, দলীয় সংহতি বিনষ্ট করে। সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত হলে জাতীয় সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ হয় রুদ্ধ। সমাজে সৃজনশীলতার পরিবর্তে দেশে শৃংখলার প্রতি কৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। এ সব কিছুই জাতীয় জীবনে অভিশাপ ডেকে আনে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে তাই সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের জন্যে ও আশংকা। রচনা করে আরো অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে স্বতঃস্ফূর্ততা জনগণের অংশগ্রহনের পথকে করে সুগম তা বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। প্রতিষ্ঠানের মূলে যে মর্মবাণী সুশাসন ও স্বশাসনের ঝংকার তোলে তাও। সমাজ এবং রাজনীতির অংগনে সামরিকীকরনের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রশাসনের সামরিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়।

সামরিক শাসন নিরীক্ষাকারী বিজ্ঞব্যক্তিরা এ বিষয়ে প্রায় মতৈক্যে উপনীত হন যে রাজনৈতিক বিকাশকে যদি জনগণের অংশ গ্রহণ ও বৈধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পথে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা হলে যে সব নতুন রাষ্ট্রে সামরিক শাসনের অধীনে এসেছিল, রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই সামরিক শাসনামল হয়ে উঠেছিল নিষ্ফলা।

Dhaka University Institutional Repository

সৈনিকবৃত্তির চেয়ে রাজনীতি আরো অনেক বড় ব্যাপার। সাফল্য লাভের জন্য, সামরিক কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমরদক্ষতা লাভের মতই রাজনীতিকদের রাজনৈতিক দক্ষতার ক্ষেত্রে নৈপুন্য অর্জন করতে হয়। একটা টেকসই ও স্বনির্ভর অস্তিত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দক্ষতা প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন আদর্শগত প্রতিশ্রুতি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা, প্রশাসনিক নৈপুন্য সমঝোতার প্রচেষ্টা। কিন্তু একটা সামরিক সরকারের অধীনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হয়, বেসামরিক লেবাস পরে ও সৈনিকেরা তাদের দীর্ঘ সামরিক জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সামরিক মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সেনাশাসকরা রাজনীতির মহৎ খেলার ব্যবহারিক তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন। তাঁরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অবাধ প্রবাহ কঠোরভাবে রোধ করেন এবং রাজনীতিকদের দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষ্ক্রীয় থাকতে বাধ্য করেন। সামরিক শাসনের কাল হচ্ছে রাজনৈতিক দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে পুরো অপচয়ের কাল। সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে প্রবেশ করার দরুণ রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করে। প্রশাসন ও রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকার ফলে সামরিক বাহিনীতে ইষাম্বিত উচ্চাভিলাষী বিভিন্ন চক্রের ও জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতি সামরিক বাহিনীর শৃংখলার প্রতিই শুধু হুমকি নয়। চক্রাকারে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারটিকে ও উৎসাহিত করবে। ক্ষমতার রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের এ ধরণের স্বৈরতান্ত্রিক পিতৃয়তা সম্পর্কিত ভূমিকাকে বুঝার জন্য বাংলাদেশের (৮২-৯০) সময়ের শাসন কালের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার্যকর সামরিক শাসক জেঃ এরশাদ ১৯৮২ সন থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে কর্তৃত্ববাদী এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং একই সঙ্গে সামরিকবাহিনী ও বেসামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরেই সামরিক বাহিনীর তদানীন্তন প্রধান এরশাদ বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব চালু করেন। রাজনৈতিক দলগুলো সে তত্ত্ব মেনে না নিলে ও তিনি সেই তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে দখল করেন ক্ষমতা। তারপর থেকে এরশাদ আর পিছনে ফিরে তাকাননি। বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করে সেই ক্ষমতাকে রাজনৈতিক বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৮৬ সালে তিনি নিজেকে সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। এরশাদ রাজনৈতিক মহলে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য একটা গণভোট, দুটি সংসদ এবং একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু এই নির্বাচনগুলি ছিল এক প্রকার প্রহসন। রাষ্ট্রপতির পদ আঁকড়ে থাকলেও এরশাদের শাসনের পিছনে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছিল না। ছিলনা কোন বৈধতা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি বরাবরই ছিলেন এক ঘৃণিত ক্ষমতা জবর দখলকারী।

যদিও তাঁর ক্ষমতা গ্রহণকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল ক্যু' বলেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের যথার্থতা এখানেই যে, জেঃ এরশাদ শুধু নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেই ক্ষমতা দখল করেননি। উপরন্তু তিনি জনসমর্থিত অনুমোদনসিদ্ধ একটা গ্রহণযোগ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন। যে তিনটি জাতীয় নির্বাচন তাঁর সামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় তার সব কটাই বিরোধী দলগুলো বর্জন করে কিংবা ভোটারদের অংশ গ্রহণ ছিল নগণ্য। তদুপরি নির্বাচনগুলোর ফলাফলও বিতর্কিত থেকে যায়। জেঃ এরশাদ তাঁর জাতীয়পার্টিকেও আদর্শ ভিত্তিক একটা কার্যকর রাজনৈতিক বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক বিমুখ আচরণ এবং দলগঠনে অনাগ্রহ তাঁর বেসামরিক সহকর্মীদের অনেককেই হতাশ করেছে, এ কারণেই বলা যেতে পারে যে নির্বাচন আয়োজন ও দল গঠন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এরশাদ তাঁর সরকারের বৈধতা অর্জন ও অংশ গ্রহণের সংকট কাটিয়ে দেশে রাজনৈতিক স্থিতি আনয়নসহ

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বহু সংখ্যক সামরিক অফিসারকে বেসামরিক দায়িত্বে নিয়োগদানের ফলে সরকার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সামরিক-বেসামরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সামরিকবাহিনীও অনেক যোগ্য নেতৃত্ব থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত হয়েছে। সংগত কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এই শাসনামলকে নিঃসন্দেহে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল কতিপয় সমমনা রাজনীতিকদের সহায়তায় মূলতঃ একটা সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু এরপরও স্বাধীন বাংলাদেশে গত উনিশবছরে এরশাদের মতো একটানা ৯ বছর কেউ শাসনের গদিতে বসে থাকতে পারেননি। জাতিরজনক শেখ মুজিবুর রহমান নবজাত স্বাধীন দেশকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন মাত্র চারবছর। প্রবল ব্যক্তিশালী এবং জনপ্রিয় নেতা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় পাঁচ বছরের বেশী থাকতে পারেননি। এই দু'জন নেতারই পৃথিবী থেকে বিদায়ের রক্তাক্ত কাহিনী পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। তুলনায় অনেক নগন্য হলে ও এরশাদ সুকৌশলে এক টানা ৯ বছর রাজত্ব করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষকে এরশাদের মতো এক রাজনৈতিক পর গাছার পক্ষে একটানা ৯ বছর শাসন করা কম কথা নয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শহুরে নাগরিক ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ফলে এ শাসন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। এই সময়ে ক্ষমতায় থাকাটাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সমাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছে। সামরিক সমাজ, ও সিভিল সমাজ 'প্রথমটির অধঃস্তন থাকবে দ্বিতীয়টি' এ কারণে সিভিল সমাজেরসহযোগী তৈরী করতে চেয়েছে অর্থ ক্ষমতা ও অস্ত্রের প্রলোভন ভয় দেখিয়ে এবং এ ধরনের একটি সহযোগীশ্রেণী তারা নির্মাণ ও করেছিলেন।

সামাজের প্রতিটি পর্যায়কে দমিত করে নিজের অধীনে আনার ফলে সমাজের বিশেষ করে মধ্য শ্রেণীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন এরশাদ রাষ্ট্র ও নিজেকে এক করে ফেলেছিলেন। রাষ্ট্র ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন শাসকদের। মধ্য শ্রেণীর আত্ম মর্যাদা এতে হয়েছিলো ক্ষুন্ন। বুটের শাসন তারা মেনে দিতে সম্মত হয়নি। সংস্কৃতিসেবীরা এ শাসনকে দেখেছিলেন সজীব সংস্কৃতি, প্রগতিরুদ্ধ করার শাসন হিসেবে। ধার্মিকেরা ধর্মের আড়ালে অপশাসন ও ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করা মেনে নিতে পারেননি। ব্যবসায়ীরা কয়েকটি পরিবার ও গোষ্ঠীর একাধিপত্য ব্যবসা-বাণিজ্য মেনে নিতে চায়নি। ছাত্র শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বার বার সহিংস হামলা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন তারা। আইনজীবিরা সামরিকায়ণের আইনগত ভিত্তি সমর্থন করতে পারেনি। স্বাস্থ্যনীতি প্রত্যাখ্যান করলেন ডাক্তাররা। এক কথায় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিণত হয়েছিলো বারুদস্তূপে। একদিক থেকে বলা যায় গণ আন্দোলন বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে।

জনতার দুর্বার সংগ্রামের মুখে সমূলে পতন হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদের। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন এ দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, এবারের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ও সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমেছে, গুলিবর্ষণের মুখে কারফিউ ও জরুরী আইন ভংগ করেছে। স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। সংগ্রামী জনগণ প্রমাণ করেছে ক্ষমতার সকল উৎস জনগণ, অস্ত্র নয়। শত শহীদের রক্তস্নাত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় হয়েছে।

১৯৯০ -এর স্বৈরাচার বিরোধী বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে হলে আন্দোলনে গড়ে ওঠা ঐক্য সুসংহত করতে হবে। আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকেই গণতন্ত্র বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির উচ্চাশা, দলীয় সংকীর্ণতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা মএ দেশে গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী হতে দেয়নি। অতীতে সুষ্ঠ গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ ও খুব পাওয়া যায়নি। স্বৈরশাসন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঘটেছে চরম অবক্ষয়। আজ তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিভাবে পুণরুদ্ধার করা যায়। রাষ্ট্রযন্ত্র রাজনৈতিক দল সমূহ এবং সমাজের সর্বস্তরেই গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

এ কথা তর্কাতীত যে উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রশ্নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে অবশ্যই গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে আমলাদের ও হতে হবে অনুগত ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য ও আমলাদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে পেশীশক্তি ও অর্থবলের অশুভ প্রভাব দূর করতে হবে এবং সৎ, নিঃস্বার্থ ও বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে আনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল গুলোকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। বর্তমান গণআন্দোলনের পথিকৃত ছাত্র ঐক্য এবং রাজনৈতিক দল গুলোর গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার ফলেই আমরা আজ এই ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌছেছি। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আমরা যেন অতীতের মত আবারও ভুল না করি এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারি।

৯০ -এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের শিকল ছিন্ন করে লাভ করেছে সম্মানজনক এক অবস্থান জাতি হিসাবে। রক্তঝরা আন্দোলনের দিনগুলো অতিক্রম করে আবারো প্রতিষ্ঠা করেছে সমাজে গণতান্ত্রিক এক ব্যবস্থা। পরাজিত হয়েছে স্বৈরাচার। বিধ্বস্ত হয়েছে স্বৈরাচারের অচলায়তন। গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারের পতনের মাধ্যমে দেশে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ রচিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই সরকার এবং সংসদ দেশে কতখানি প্রতিষ্ঠা করবে তার উপরই নির্ভর করবে ১৯৮২-১৯৯০ -এর গণআন্দোলনের সার্থকতা। তবে সেই সংগ্রাম স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার চেয়েও বেশী কঠিন, জটিল এমন কি বেদনাদায়ক ও হতে পারে। যত যন্ত্রনাদায়কই হোক না কেন, আজকের বিশ্ববাস্তবতায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প বাংলাদেশে যে নেই তা সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১। ভ্লাদিমির পুচকভ, বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা (১৯৭১-৮৫), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

২। মোশারফ হোসেন, বাংলাদেশের সমাজ ও সামরিক শাসন, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৩। আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৭০।

৪। আবু সাইদ, ফ্যাক্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস ঃ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, ফেয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৬।

৫। ইব্রাহিম রহমান সম্পাদিত, দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, জনকথা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৬। মুনতাসীর মামুন, গণতন্ত্রের অন্তিমলগ্নে, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২।

৭। এম, এ, হামিদ, (লেঃ কর্ণেল), তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, ঢাকা, ১৯৯৩।

৮। আতিউর রহমান, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের চালচিত্র ঃ রাজনীতির সামরিকীকরণ, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

৯। আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশের সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসীর লড়াই, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

১০। আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

১১। ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম, সৈনিকের রাজনীতি, ইষ্ট ওয়েষ্ট পাবলিকেশনস্, লন্ডন এস, ডব্লিউ, ১২, ৯ কিউ, আর, ১৯৮৯।

ইংরেজী

1. Ziring, Lawrence. Bangladesh : From Mujib to Ershad. Dhaka : University press Limited, 1992.

2. Ershad, Hussain Mohammad, Light the golden lamp, Published by Roushon Ershad, Rangpur, 1983.

3. Khan, Zillur Rahman, Leader Ship crisis in Bangladesh, UPL, Dhaka, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্ট, প্রচারপত্র

১। গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন - ২, ঢাকা, ১৯৯০।

২। ছাত্র ঐক্যের বুলেটিন ঃ ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯০, প্রকাশক ঃ ছাত্রঐক্য।

৩। জনগনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে গণতন্ত্রকামী ও দেশ প্রেমিক পুলিশ বাহিনীর একাত্মতা ঘোষনা (প্রচার প্রত্র), গোপন সার্কুলার নং ১, ০৩/১২/১৯৯০।

৪। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী যৌথ পরিষদ, সরকারী কর্মচারীদের প্রতি খোলা চিঠি, ০৭/১১/১৯৮৭।

৫। বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, মার্চ, ১৯৯০, পৃঃ ২৭, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন স্বাস্থ্য নীতির বিরোধীতা করছেন কেন ? (প্রচার পত্র)

প্রবন্ধ

১। এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক নির্ভর ও দল ভুট প্রবণতা, সাপ্তাহিক বিক্রম, ঢাকা, ১৯৮৮।

২। Rahman, Hussain zillur, The Landscape of violence : Elections and political culture in Bangladesh. The Journal of Social Studies, Dhaka, July, 1990.

3. Talukder Maniruzzaman, Civilization of Military regimes, A Comparative Analysis, Biss Journal, Vol. 1, 1980.

4. Md. Ataur Rahman, "Bangladesh in 1983 : A turning point for the Military, Asian survey, 24 : 2 (February, 1984), P. 240.

বাংলা সংবাদপত্র

১। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৯৯০, ৯১, ৯২।

২। দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ১৯৯৩,৯৪।

৩। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৯৯০,৯১,৯২,৯৩।

ইংরেজী সংবাদপত্র

1. The Bangladesh Observer, Dhaka, 1977.
2. The Guardian, Manchester, 1962.
3. The Holiday, Dhaka, 1981.
4. The People, Dhaka, 1971.